যে শাখে ফুল ফোটে না

পি, সি, সরকার এণ্ড কোং

২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই গ্রন্থের রচনা কাল ১৩৪০
সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।
প্রচ্ছদ-পটের ভাব ও রূপ দিয়েছেন
শ্রীযুক্ত ভবেশ চন্দ্র সেন। তাঁকে
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তারাপদ রাহা

রথযাত্রা
১৩৪১

মানুকে দিলাম

প্রথম কথা কহিল নারাণ কি [illegible]—'

নারাণির নারাণ নাম আজ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। শাদা সেমিজের উপর কালো নরুন পেড়ে কাপড়ের আঁচলটা ওর কিছুতেই বাগ মানে না, ও তাকে কোমরে জড়াইয়া লইয়াছে। মাথায় কাপড় দিবার বালাই ওর কোনও দিনই নাই, আজ ত না থাকিবারই কথা, রাগে ওর মুখচোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—

'মেজদাদাবাবুকে আস্‌ছে ফাগুনেই আবার বিয়ে দেওয়াচ্ছি। খৃষ্টানী চালাতে এসেছেন রায় বাড়ী, ম'লো যা! তুমি হাস্‌ছ রাঙা-বৌদি,—এই আমি বলে রাখ্‌ছি, বিয়ে যদি আমি না দেওয়াতে পারি তবে আমি—'

বিভা বাধা দিয়া কহিল—'থাক্ তোর আর পির্‌তিজ্ঞে কর্‌তে হবে না, খুব হয়েছে! বিয়ে দেওয়া তোর ইচ্ছে নাকি—যার বে' সে যদি না করে, পায়ের লাথি খেয়েও সে যদি মাথায় করে রাখে তোর আমার কি—'

বলিতে বিভার চোখ দুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। অন্যদিন হইলে নারাণ একটু হাসিত অথবা একটু টিপ্পনী কাটিত, কিন্তু আজ তার মন সত্যই ভাল ছিল না। পঁচিশ বছর রায় বাড়ীতে কাজ করিয়া সেও দশজনের একজন হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাদের সুখ-দুঃখকে

সে নিজের বলিয়াই গ্রহণ করে, নইলে এমন একটা সুযোগ নারাণ কোন দিন উপেক্ষা করে নাই। তা' ছাড়া এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতেও তাহাকে কোন দিন দেখা যায় নাই। বর-কণে ত অন্ততঃ বিশ মিনিট হইল রওনা হইয়াছে—এতক্ষণ—

লেখা দুইদিনেই নূতন বউয়ের ন্যাওটা হইয়া পড়িয়াছিল, তাই নমিতা চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই সে কাঁদিতেছে। বড়বৌ তাহাকে লইয়া এতক্ষণ স্বামীর কাছে ছিলেন—কান্না থামিল না দেখিয়া তাহাকে কোলে করিয়া বাহির হইতেই নারাণের তর্জ্জন শুনিতে পাইলেন।

বিভা ততক্ষণ চোখ মুছিয়া লইয়াছে।

নারাণের মুখের ঝড় থামিয়াছে বটে কিন্তু আঁধার ঘুচে নাই। বড় বৌ হাসিয়া বলিলেন—

'মাগো! এত দিনে বাড়ীটা যেন একটু জুড়োলো। কি বৌ-ই এল বাড়ীতে? আগে এর ক'টা বে হয়েছে কে জানে?'

নারাণ আবার ক্ষেপিয়া উঠিল—

'তোমাদেরই ত দোষ বাপু, ভাল দেখে আন্‌তে পারো নি? বাড়ীতে কি লোক ছিল না?'

'তুই আর বলিস না নারাণি, লোক ত ছিল' কিন্তু কে কার কথা শোনে, শুনি? দাদা কি কম চেষ্টা করেছে? আফিসের অবিনাশ বাবুর অমন সুন্দর মেয়ে নগদ হাজার টাকা আর গয়না নিয়ে কত সাধাসাধি—তাতে যে বাবুর মন উঠ্‌লো না—'

বিভা উত্তর করিল—'তা' কি করে হয়,—পনেরো বছরের মেয়ের সাথে কি ঠাকুরপোর মানায় দিদি?'

যে শাখে ফুল ফোটে না

'তবে যাও—তুমিই তার গলায় মালা দাও গিয়ে ? পঁয়ত্রিশ বছরের ছেলের জন্যে কে আর তিরিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে রাখবে বল ?'

কথাটা বলিয়াছিলেন বড় বৌ ঠাট্টা করিয়াই, কিন্তু মনে হইল বিভার মুখ বুঝি ভার হইয়া উঠিল। কিছুদিন আগে এমনি একটা কথা লইয়া বড়বৌ স্বামীর কাছে ধমক্ খাইয়াছিলেন—কিন্তু নিজের অন্যায় তিনি মনে মনে একটুও স্বীকার করেন নাই।

বিভা সত্যই নরেনকে অনেকদিন হইতে একটু বেশী যত্ন করে, হয়ত সে অভাগা বিপত্নীক বলিয়া—হয়ত বা—

নরেনও অনেক সময় বিভার সহিত গল্প করিয়া বই পড়িয়া সময় কাটায়—

এখন না হইলেও অদূর ভবিষ্যে ঘটনাটা কতদূর গড়াইতে পারে—তাহা লইয়াই মেয়ে-মহলে একটু কানাঘুসা চলে।

কথাটা বিভার কানেও গিয়াছিল। তাই ঠাট্টা করিয়া বলিলেও বড়বৌয়ের নিজের কানেও কেমন বেসুরো লাগিল। তা' ছাড়া নমিতার কথা লইয়া একটা বড় মজলিশ করিতে তার মনটা উশ্‌বিশ্‌ করিতেছিল, সে সভায় বিভাকে হারাইলে চলে· না। ফুল শয্যার রাত্রের সকল ঘটনা শুধু বিভাই একা জানে। সারা রাত নিজের লোকটী ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে আর কাহারো কি চলে ?

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলিল না।

বড় বৌ বলিলেন—'কিরে নারাণ কথা বলিস না যে! এতক্ষণ ত দুইজন খুব চেঁচাচ্ছিলি, আমি আসতেই সব চুপ হয়ে গেল কেন ?'

নারাণের মেজাজ কখন কেমন থাকে বলা যায় না,—বলিল 'কি বল্‌বো বলো, বাড়ী ভরতি এখনও লোক,—নিজেদের কেলেঙ্কারীর কথা ঢাকঢোলে না পিট্‌লে কি আর মন ওঠে না !'

'তোর ন্যাকামী রাখ,—কেউ যেন কিছু জানে না, নোতুন বউয়ের ডেঁপোমী অন্ততঃ বিশজন মেয়ে নিজের চোখে দেখেছে, কাকে লুকোবি শুনি ?'

সত্যই ত নারাণ ইহার কি উত্তর দিবে ?

বিভা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার বলিল—'দেখেছ,—কিন্তু তাই নিয়ে যে এখুনি একটা মস্ত বড় হৈ চৈ করতে হবে, এমনই বা কি কথা আছে দিদি,—অমন একটুখানি গোলমাল প্রথম বিয়েতেও অনেকের হয়,—দু'দিনে আবার সব ঠিক হয়ে যায়।'

একটা কি কঠিন কথা বড়বৌয়ের প্রায় মুখের আগায় আসিয়াছিল,—অনেক কষ্টে তাহাকে সংযত করিয়া তিনি বলিলেন—'তা নিয়ে একটু আলোচনাও মেয়ে মহলে চিরকাল হয়েই থাকে—'

বাগবাজারের অমলবাবুর স্ত্রী উষা মলিনাকে লইয়া হাজির হইলেন। তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বড়বৌ—বলিলেন—'শোন ভাই কথা,—ফুল শয্যার রাত্রে বউ গিয়ে বরের সঙ্গে এক লেপে থাক্‌বেনা,—মালা খুলে ফেল্‌বে,—বর আদর ক'রে হেসে কথা বল্‌তে গেলে মুখ ভার করে থাকবে,—বিশ বছরের ধাড়ী মেয়ে হ'য়ে এই সব ঢং চালাবে—আর তা' নিয়ে লোকে একটু কথা বল্‌তে পার্‌বে না—'

উষা নব্যধরণের একটু বাঁকা হাসিয়া বলিলেন—'খোঁজ করে দেখুন, হয়ত মেয়ের 'লাভার্‌' আছে,—স্কুলে ত পড়তেন।'

মলিনাও চুপ করিয়া থাকে না, বলে—

'কে একটী ছেলে নাকি ওঁকে দিদি বলে ডাকত, একরাশ প্রেজেণ্টস্ পাঠিয়েছে—আমাকে দেখিয়েছে!'

বড়বৌয়ের মুখ খুশীতে ভরিয়া গেল। মলিনার বাঁ হাতে চাপ দিয়া বলিলেন—

'তুমি দেখি অনেক খবর জানো—তোমার সঙ্গে বুঝি খুব বন্ধুত্ব হয়েছে?'

মলিনা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল,—'বন্ধুত্ব আর কি—একটু পরিচয়।'

বিভা বাঁ গালে হাত রাখিয়া— একদৃষ্টে ইহাদের দিকে তাকাইয়া ছিল।

বড়বৌ মলিনার মুখ হইতে কিছু সংবাদ অন্ততঃ জানিতে চান,—বলেন—'তবু,—একটু ত!—বল্‌লে না বরের কথা কিছু?'

'কি আর বল্‌বে?—পরের বৌ হতেই ওর ইচ্ছে ছিল না,—ও বলে—সবার জন্যেই যে বিয়ে-ব্যবস্থা এটা সমাজের মস্ত বড় একটা ভুল, আর তাকে বুকের রক্ত দিয়ে একদিন এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

বড়বৌয়ের চোখ দুটী রাগে জ্বলিয়া উঠিল—

'শোন আস্পর্দ্ধার কথা! আমার নিজের বোন বা মেয়ে হ'লে ঝ্যাঁটা মেরে বাড়ী থেকে তাড়াতাম। লেখা পড়া শিখে ধিঙ্গী ধিঙ্গী মেয়ে ঘরে এনে আজকালকার ঘরগুলি উচ্ছন্ন গেল।

এত অশান্তি তো আগে ছিল না।—ভলেণ্টারী করতে গিয়ে মুসলমানের ঘরে বাঁধা পড়ে, তবেই এদের উচিত শিক্ষা হয়।'

বিভা এইবার বড় বৌয়ের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল—'বাপ মার কথা শুন্‌তে গিয়ে যাদের ঘরে বাঁধা পড়ে—তারাও বড় কম অত্যাচারী নয় কি বড়দি।'

একটা শক্ত জবাব শুনাইবার পূর্ব্বে বড় বৌয়ের মুখ চোখ কেবল রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল—এমন সময় ছেলে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'মা, বাবা তোমায় ডাকছেন্,—উপরে এস শীগ্‌গীর্—'

ইন্দুর আসিতে অনেক দেরী,—মার জলযোগ না হইলে নয়। ডীজ্-এর আলোটা কমাইয়া দিয়া প্রভাত চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল।

রাজ্যের চিন্তা রেলগাড়ীর যাত্রীর মত মনের কোণে এলোমেলো আসিয়া জড় হয়—

জীবনটা কি,—ইন্দু আসে না কেন? ছাই-কাজ কি শেষ হয় না?—কা'ল বাদে পরশুই ত চলে যাবো—আর এলেই বা কি?—Gray বলেছেন—

Gay hope is theirs by fancy fed
Less pleasing when possessed.

—কিন্তু শান্তি সে কি পেতে পারত না?

যোল বছর বয়সে বিয়ের সে কি বুঝত?—

তার বউ ইন্দুর মত মেয়ে?—

নমিতার বয়স কত?—প্রায় বাইশ হবে,—তারও বাইশ—

কি চমৎকার কথা বলে—গোটা দুই চার কথা বলেছে—কিন্তু কী মিষ্টি—

দূরে ওটা কি গেয়ে গেল? পাপিয়া বুঝি—

নরেন দা ত শ্বশুর বাড়ী।—এ কয় দিনে হয়ত ভাব হয়ে গেছে। রহস্য-ভরা স্নিগ্ধোজ্জ্বল দু'টী চোখ মেলে হয়ত নমিতা নরেনদার

দিকে চেয়েছে। হ'ক হ'ক—ওদের জীবন সার্থক হ'ক; প্রেমের উচ্ছল মদিরায় ওরা জীবন-পেয়ালা ভরে নিক্। জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে যে কথা প্রকাশের পথ খোঁজে, আজ অধীরাকুল বুকে দয়িত-দয়িতা বারবার নেশার মত বলুক সেই দুটী কথা—'ভালবাসি'—একথা সত্যি করে বলতে সুযোগ ক'জনে পায়—কটা বেজেছে—এগারো-দশ ঘড়ীর এক ঘেয়ে কাঁদুনী কানে আসে—টিক্, টিক্, টিক্,—টি......

প্রভাত চোখ মেলিয়া দেখিল—পাশে ইন্দু। জাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয় না। আলো নিভানো হয় নাই—স্তিমিত, ঘড়ী দেখা যায়—তিনটা বাজিয়া—পনেরো।

প্রভাত প্রায় চার ঘণ্টা ঘুমাইয়াছে—আর দু'ঘণ্টা, তারপর রাত্রি শেষ হইবে—তারপর ?—তারপর ইন্দু জাগিবে, ঘরে দিনের আলো দেখিয়া বলিবে,—'ইস্ এত বেলা হয়ে গেছে—জাগাও নি কেন ?'

লজ্জা, ভয় দিনের শত কাজ তাহাকে ছিনাইয়া লইবে—

পুরুষের ভগ্ন জীর্ণ-ক্লান্ত হৃদয়ে নূতন উন্মাদনা দিতে এই কি মদিরা,—দিক্‌হারা নাবিকের চেয়ে-থাকার এই কি ধ্রুব তারা।

ভুল কোথায়,—দোষ কাহার ;

থাক্,—প্রভাত অত ভাবিতে পারে না,—ধীরে ধীরে ইন্দুর গায়ে হাত রাখিয়া ডাকিল—'এই !'

ইন্দু সাড়া দেয় না।

'এই, শুনছ—জাগো,—ইন্দু—'

তন্দ্রাচ্ছন্ন হাতখানা ইন্দু স্বামীর গায়ে রাখিল—।

'জাগো রাত যে ফুরিয়ে এল, কিছু কথা বলবে না ?'

আর একটু কাছে আগাইয়া জড়িত কণ্ঠে ইন্দু বলিল—'আমাকে জাগাও নি কেন ?—কতক্ষণ জেগেছ তুমি ?'

'বেশীক্ষণ নয়—'

কষ্টে চোখ মেলিয়া ইন্দু বলিল—'ক'টা বাজে ?'

'সাড়ে তিন ;—জাগানো তো তোমারই উচিত ছিল—

ইন্দু ধীরে ধীরে বাঁ হাতখানা স্বামীর গায়ের উপর রাখিল—'তুমি ট্রেইনে এসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছ দেখে আর ডাকি নি—রাগ করেছ ?'

প্রভাত উত্তর দিল না, ধীরে ধীরে ইন্দুর মাথায় চুলে হাত বুলাইতে লাগিল।

সে কাহাকে বুঝাইবে—মনের চাওয়া দেহের চাওয়া থেকে কত বড়,—প্রিয়ের একটি স্পর্শ কত শত যোজন পর্য্যটনের শ্রম—কত বিনিদ্র রজনী যাপনের ক্লান্তি মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দেয়। এ ব্যথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে ? কাহাকে বুঝাইবে ? তরুণ তাহার প্রাণ, অসীম তাহার আশা, জীবনটা দলে দলে ফুটাইয়া কাহার পায়ে উজাড় করিয়া দিতে চায় সে। ভক্ত পূজারীর অন্তরের পূজা লইবার দেবী কি এই ? হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কিসের একটা বিদ্রোহ মাথা তুলিতে চায়,—প্রভাত তাহাকে শাসন করে।

ইন্দু আবার বলে—'রাগ করো না, সত্যি তোমার কষ্ট হবে বলে জাগাই নি, আমার এক ফোটাও ঘুম পায় নি।'

প্রভাত ইন্দুর মাথায় অঙ্গুলি চালনা দ্রুত করিয়া বলে '—সত্যি রাগ করি নি,—রাগ করবো কেন, অন্যায় ত তুমি কিছু কর নি।'

এইবার ইন্দুর মনটা হাল্‌কা হইয়া উঠে,—বলে ভয়টাই দেখিয়েছিলে, অতক্ষণ চুপ করে থাকে 'সত্যি কি কখন ?'

প্রভাত এবারও উত্তর দেয় না, কিন্তু ইন্দুর মন তখন সহজ হইয়া উঠিয়াছে,—হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে—'তার পর বিয়ে হ'ল কেমন বল' ?'

'ভাল'

'অত কাটা কাটা কথা কেন, একটু ভাল করে বলতে পারো না ?'

প্রভাতের সত্যই আজ কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না,—তাহার মনের কোণে বহুদিনের পুরাণো ব্যথাটা আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে,—ইন্দুর কথার জবাবে বলিল—'বিয়ে সম্বন্ধে কি তুমি শুন্‌তে চাও, বলো,—আমি জবাব দিই।'

ইন্দুর কান্না পাইতে লাগিল,—কোথায় যেন তার কাটিয়া গিয়াছে,—সুর আজ সাবলীল নয়। স্বামীর মুখে তার নূতন বৌদির গল্প সে শুনিতে চায়,—কিন্তু এমন করিয়া নয়। সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না।

নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয় হইলেও তার কোন কোন দিক জলের মতই সহজ,—প্রভাত ইন্দুর হৃদয়ের সুখদুঃখের মাপকাটী জানিত, তাই বলিল—

'রাগ করতে নেই, লক্ষ্মী ত ! ঘুম আমার এখনও কাটে নি,—আর নরেনদার বিয়ের ব্যাপারটা বড় সোজাও নয় নিছক সুখেরও নয়—'

ইন্দু বাধা দিয়া বলিল—'থাক্, তুমি ক্লান্ত, আর একটু ঘুমাও,—রাত এখনও আছে—'

প্রভাতের চোখ দুটী ক্রমে মুদ্রিত হইয়া আসিল; ঘুমাইল কি না কে জানে?

*   *   *   *   *

পরদিন বেলা আটটায় স্নান করিয়া আসিয়া প্রভাত বিছানায় শুইয়া একখানি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিল,—হঠাৎ ইন্দু দৌড়াইয়া আসিয়া নিজের ডা'ন হাতখানা পিছনে রাখিয়া বলিল—'বলো দেবে, দেবে, দেবে—তা'লে জিনিস দেখাবো একটা—'

প্রভাত একটুও চঞ্চল না হইয়া বলিল—'দেবো, নিশ্চয় দেবো, আমি নেবোই না,—তুমি দেখাও দেখি জিনিষটা—'

ইন্দু স্বরে আবদার মিশাইয়া বলিল—'তা'লে খুলি আমি?' বলিয়া—পেছনে লুকানো খামের চিঠিখানা খুলিতে আরম্ভ করিল। প্রভাত একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে ইন্দুর মুখে চোখে প্রথমে কৌতূহল,—তারপর ক্রমে ক্রমে বিস্ময়, আতঙ্ক ও বেদনার ছায়া পড়িয়া আবার তাহা মিলাইয়া গেল। পড়া শেষ হইলে ছোট্ট একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রভাতের হাতে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিল।

চিঠি লিখিয়াছে, রাঙাবৌদি—বিভা। লিখিয়াছে—

স্নেহের ঠাকুর পো,

এত গোলমালের মাঝে কোন ফাঁকে যে পালিয়েছ, তা

জান্তেই পারি নি। ঝড় উঠ্‌লে পাখীরা সব নিজের নীড়ে ফিরে যায়,—কিন্তু এই ঝড়েই বাসা উড়িয়ে নিয়েছে—এমন পাখীও আছে।

বিপদের সময় আমাদের এমনি করে ফেলে যাওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?

তোমার নরুদা তার শ্বশুর বাড়ী থেকে—মানে—নমিতার মামা বাড়ী থেকে ফিরে এসেছেন। খবর ওখানে গিয়েও কিছু ভালো বলে মনে হয় না। আকার ইঙ্গিতে যা বুঝ্‌ছি তাতে নমিতা আজও অনমিতাই রয়ে গেছে। এদিকে ঠাকুরপোর অবস্থা দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারতে—কত বড় একটা বেদনা সে মনের মাঝে চেপে রাখছে। ভাল করে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হয়। কারো সঙ্গে বেশী কথা বলতে চায় না,—কথায় কথায় বেদনা প্রকাশের সম্ভাবনা ঘটে উঠ্‌লে হেসে আত্মগোপন করে।

কারো সঙ্গেই আমি এ কথা ভাল করে আলোচনা করতে পারছি না।—আমার উদ্বেগের কথা জান্‌লে সবাই বল্‌বে—ওর এত মাথা ব্যথা কেন? মার পোড়ে না পোড়ে মাসীর! আপন বৌদির কিছু এল গেল না—আমি ত কোথাকার কে? ইন্দুর কাছে থেকে অনুমতি নিয়ে তুমি শীঘ্র এস—নইলে কিছু একটা বিপদ হওয়া অশ্চর্য্য নয়,—এদের বংশের ধারা ত তুমি জানো,—মেজাজ ত প্রায় সবারই এক, নরু ঠাকুপোও যে খেয়ালের বশে নমিতাকে চির কালের জন্য ত্যাগ করতে না পারে, তা নয়। যে আগুণ জ্বলেছে তাতে বড়দিদির ঘৃতাহুতি চলেছে। এ সময়ে তুমি না এলে আমি একা কিছুই করে উঠ্‌তে

পার্‌বো না। বয়সে অনেক ছোট হ'লেও ঠাকুরপো তোমার কথা শোনে,—কারণ সে তোমায় সত্যিই ভালবাসে।

ইন্দুর অনুমতি নিয়ে তুমি শীঘ্রই এস ভাই,—তোমরা দু'জনেই আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও—ইতি

তোমার রাঙাবৌদি—বিভা

নমিতার মামা সত্যব্রত রায় ইকনমিক্সের প্রফেসার হিসাবী লোক। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে দোতলায় তিন খানি ঘর ভাড়া করিয়া বাস করেন। স্ত্রী মন্দাকিনী নিঃসন্তান, নমিতা তার কন্যার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সত্য বাবু নীরস অর্থনীতির আলোচনা করিলেও মন্দাকিনী ছিলেন কবি, সাহিত্যিক। স্বামী কলেজে যাইবার পর কর্ম্মহীন মুহূর্ত্তগুলি তিনি পড়া-শুনায় কাটাইয়া দিতেন, সন্তানের অভাব-দুঃখ তাই তার অন্তরকে বেদনা দিতে সুযোগ পাইত না। বাংলা লেখা-পড়া তিনি ভালই জানিতেন, স্বামীর অধ্যাপনায় ইংরাজীতেও তাঁর বেশ দখল হইয়াছিল, তাই বিদেশী মনীষীদের চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ও তাহার দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। বাৎসল্যের অভাব ও মাধুর্য্য অনুভব না করিয়াই হয়ত জীবনটা এক রকম কাটিয়া যাইত, এমন সময় আসিল নমিতা তাহার মানস কন্যার মত।

মধুপুরে হাওয়া খাইতে গিয়া নমিতার মা ও বাবা দুজনাই পরপর কলেরায় মারা যান। ভৃত্য নিবারণ নমিতাকে আনিয়া সত্য বাবুর হাতে সঁপিয়া দেয়। এই হইল নমিতার বাল্য জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

সন্তানহীন দম্পতি নমিতাকে পরম আগ্রহেই গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। মামার আশ্রয়ে তার আদর যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। তাহাকে বেথুনে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং পড়াশুনা বেশ ভালই চলিতেছিল। নমিতার যে বার ম্যাট্রিকুলেশান দিবার কথা, সেবার মন্দাকিনী হঠাৎ স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত হন, সত্য বাবু রোজ কলেজ কামাই করিতে পারেন না দেখিয়া নমিতা ইচ্ছা করিয়াই স্কুল ছাড়িয়া আসে। প্রায় বৎসরাধিক পরে মন্দাকিনী সুস্থ হইলে তাহাকে আবার স্কুলে পাঠাইবার প্রস্তাবনা চলে, কিন্তু নমিতা তাহাতে সম্মত হয় না। যাহারা তাহার বয়সে ছোট, নীচে পড়িত, তাহাদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসিতে নমিতার মর্জ্জিতে বাধে। তা' ছাড়া স্কুলের বাধাধরা রুটীন মাফিক পড়াশুনা করিতে আর তার ভাল লাগেনা। তার জীবনের পথে Algebra, Geometryর কোন সার্থকতা আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। মামীমার অসুখের সময় ইংরাজী বাংলা অনেক সাহিত্য সে পাঠ করিয়াছে, এ বিষয়ে মামীমাই তা'র গুরু। মামীমার লাইব্রেরীতে বিদেশী সাহিত্যেরও অভাব ছিলনা, অবশ্য সে সবগুলিই ইংরাজী তর্জ্জমা। নমিতা তাহার অধিকাংশ পড়িয়াছে, যেখানে বোঝে নাই মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—দরকার হইলে অভিধান দেখিয়াছে। মনের খোরাক মন যখন স্বাধীন ভাবে আহরণ করিতে শিখে তখন তাহাকে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ রাখা দায়। নমিতার স্কুলে না যাওয়ার কারণ মূলতঃ এই।

নমিতার বন্ধু বলিতেও কেহ ছিল না। বন্ধু বলিতেও ঐ মামী গুরু বলিতেও ঐ মামী। মন্দার সহিত গল্প করিয়া বা পড়িয়া

নমিতা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তখন এস্‌রাজ লইয়া বসিত। এ শিক্ষাও তার মামীর। স্বামীর সঙ্গে এ সব বিষয়ে মন্দার কোন মিল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নমিতার মত এমন বোদ্ধা শিষ্যা না পাইলে হয়ত মন্দার স্নায়ুরোগ আরও চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইত।

মন্দা নিজের চিন্তাধারাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন এই নমিতার ভিতর,—পারিয়া ছিলেন কিনা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং নমিতার ভাল মন্দের জন্য কেউ যদি মন্দাকেই একমাত্র দায়ী বলিয়া মনে করে তবে তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু মন্দা নমিতার মধ্যে নিজেকে কোনদিনই জাহির করে নাই—তাহার নিজের চলার পথ নিজে রচনা করিতে বলিয়াছেন। নমিতা করেও তাই, তবুও তাহা লইয়া কথা হয়।

বিবাহের পর নমিতা ফিরিয়া আসিয়াছে। নরেন মাত্র তিন দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনী লক্ষ্য করিয়াছেন নরেন ও নমিতার মধ্যে যেন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব। নমিতা যে মেয়ে তাহাতে শীঘ্র যে কোন পরিবর্ত্তন আসিবে তাহাও মনে হয় না। এ সম্বন্ধে নমিতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বা উপদেশ দিতে ও মন্দার বাধে।

বিবাহের সম্বন্ধ যখন উপস্থিত হয় তখনই মন্দা বাধা দিয়াছিলেন। নমিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল—বিবাহই সে করিবে না। সত্যবাবু সে কথা ছেলেমানুষের খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

নরেন সত্যবাবুর ছাত্র,—শুধু ছাত্র নয় বিশিষ্ট ছাত্র, তথা বন্ধু, তা' ছাড়া নানাবিধ export এর ব্যবসায়ে সে প্রভূত বিত্তশালী।

লেক রোডে বিশাল-অট্টালিকার মালিক, অনতিক্রান্ত—যৌবন,—কিসে সে অযোগ্য? বিশেষ করিয়া সত্যবাবুর কাছে নিজে সে কৌশলে নমিতার পাণি প্রার্থনা করিয়াছে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে সত্যবাবুর কাছে নরেনের যাতায়াত ছিল, নমিতাকে বহুবার সে সম্মুখে দেখিয়াছে।

বিবাহের সম্বন্ধ যখন পাকা হইতেছিল, তখন নমিতা হয়ত বাধা দিতে পারিত। বিশেষতঃ মন্দার গুরুত্বে যে শিক্ষা সে পাইয়াছে তাহাতে বাধা দেওয়াই তাহার উচিত ছিল। কেন যে দেয় নাই সেই কথাই বলিব।

নরেনের দাদা প্রকাশবাবুর সঙ্গে বিবাহের কথা একরূপ পাকা করিয়া সত্যবাবু রাত্রি ১০টায় ফিরিয়া আসিলেন। মন্দা স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর নমিতাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কুমারী থাকিবে বলে।

নমিতার এই কথার উপর নির্ভর করিয়া যে সত্যবাবু কাজ করিবেন না এ কথা সে বোঝে,—আর এমন একটা সমস্যার দিনে যদি তার চোখে ঘুম না আসে,—তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। রাত্রে ছাদে পায়চারী করিতে গেলে মামা মামীর কথা নমিতার কাণে যায়—

'তুমি পণ্ডিত হয়ে এমন কথা কি করে বলো?'

'কিন্তু তোমরা যে কথা বল্‌তে চাও সেই যে একমাত্র ঠিক এ কথাও জোর করে কেউ বল্‌তে পারে না। এদেশে এমন বিয়ে ত শুধু একটা হচ্ছে না,—আর এমন বিয়েতে সকল মেয়েই যে অসুখী হয়েছে তা তোমায় কে বল্লে,—দো'জ বর হ'লেই যে স্ত্রীর

ভালবাসা পায় না এ কথা তোমায় কে বললে—আমাদের কলেজের সুকুমারবাবু—'

'রেখে দাও তোমার সুকুমার বাবু,—তুমি তার স্ত্রীর মনটা অমনি একেবারে বুঝে ফেল্লে,—মুখে একটু ভালবাসার কথা বলছে,—কি একটী ছেলে পেটে ধরেছে অমনি তোমরা বুঝে ফেল্লে যে ভালবাসে, পুরুষ জাতটা এমনি হাবলাই বটে।'

'তুমি বোঝ না,—ঠিক মনের মত জগতে কয়টা couple মেলে,—তবু মিল হয়ে যায় কেন জান?—Sex life—দাম্পত্য জীবনে যত কিছু অমিল অসামঞ্জস্য সব সিমেণ্ট করে দেয় এই—'

নমিতার বড়ই লজ্জা করে,—কানে আঙ্গুল দিয়া সরিয়া যায়। আবার যখন ফিরিয়া আসে—শোনে—

'যদি নিজে মুখে কিছু আপত্তি না করে তবে এই বিয়েই দেব আমি। টাকা কোথা বল? করি ত মাষ্টারী, ঘর ভাড়া আর বই কিনিতেই ত সব টাকা ফুরিয়ে যায়। ও স্বয়ম্বরা হয়ে বিয়ে করতে গেলে কত টাকা খসবে তার কি ঠিক আছে?—নিজের ছেলে পিলে নেই,—কোন সাধই মিটিল না জীবনে। কলেজ থেকে বন্দোবস্ত করেছি—আসছে ফেব্রুয়ারী থেকে দু'বছরের ছুটী নেবো,—একবার কালাপাণি পার হ'তে চাই। তার আগেই নমিতার বিয়ে দিতে হবেই। তোমাদের খেয়াল মত বর খুঁজতে গেলে আমার খেয়ালটী বাদ দিতে হয়,—বেছে নাও।'

এবার যার মুখে উত্তর শুনিতে হইবে তার মুখের একটী বেসুরো কথা সে সহ্য করিতে পারিবে না। দুই হাতে কান ঢাকিয়া নমিতা নিজের ঘরে পালাইল।

সে দিন প্রভাতে ভজহরি উনানে আচ্ দিতে যাইবার সময় চেনা গন্ধে মুখ ফিরাইয়া দেখে নমিতা জানালার ধারে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছে—

'দিদিমণি, বসে আছ যে!'

চীৎকারে লজ্জা পাইয়া নমিতা বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়াছিল।

শোনা যায় ইহার পর এ বিবাহে নমিতার মত পাইতে কিছুই বেগ পাইতে হয় নাই।

রান্নাঘরে রোজ সন্ধ্যায় মজলিশ বসে। সভ্য সংখ্যা অবশ্য কম, তবু আসরটা মাঝে-মাঝে বেশ জমিয়া ওঠে।

বামুণ ঠাকুর ঘরের এক কোনে রাঁধিতে থাকে,—বারান্দায় নারাণ তরকারী কোটে, বড়বৌ মীণাকে দুধ-বার্লি খাওয়ায়, রেখা পাশে আসিয়া বসে,—মুখে কথা চলিতে থাকে—নানা কথা।

বিভা আসিলে কোন কোন কথার সূত্র কাটিয়া যায়। উহারা তাহাকে বড় পছন্দ করে না,—কারণ আলোচনা অনেক সময় তাহার বিপক্ষেও। তবু তাহাকে আসিতে হয়, কারণ এ বাড়ীর দুই নম্বর বামুণ ঠাকুর সে। আলোচনার নূতন খোরাক জুটিয়াছে—নমিতা।

তাহার অদ্ভুত ব্যবহার ইহাদিগকে শুধু বিস্মিত করে নাই,—ক্ষুব্ধ ও ভীত করিয়া তুলিয়াছে। অন্ততঃ মজলিশের আলোচনায় ত তাহাই বুঝায়।

নমিতার কথা বলিতে গিয়া কাহার ও ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে; কাহারও সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে,—কাহার ও বা লজ্জায় মরিতে সাধ যায়।

আসরে আজও নানা ভাবের অভিব্যক্তি চলিতেছিল—হঠাৎ বিভাকে আসিতে দেখিয়া বড়বৌ নারাণকে ইসারায় থামিতে বলেন।

নারাণ তাচ্ছিল্যের একটা কুৎসিত ভঙ্গী করিয়া ঠোঁট উলটায়—'বয়ে গেছে'।

বিভা ততক্ষণ আসিয়া গিয়াছে।

'কি গো রাঙা বৌদি, তুমি কি বলো ?'

'কিসের'

'এই তোমাদের নোতুন বউয়ের গো, নোতুন বউয়ের।'

বিভা একটু মৃদু হাসিয়া ময়দা আনিতে যায়, রাত্রির রন্ধনে এইটী তাহার নিত্য কর্ত্তব্য, প্রকাশ ও নরেন রাত্রে রোজ লুচী খান।

নারাণ বড়বৌয়ের দিকে তাকাইয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বলে—'উনি তাকে ভালই দেখবেন,—জহুরী জহর চেনে। দু'জনের রূপ আছে, গুণ আছে—এসব নোংরা কাজ ওদের ভালো লাগবে কেন ? দু'বেলা সাবান পাউডার, ভাল কাপড় জামা, নভেল এসব পেলে কে আর রাঁধ্‌তে আসে বলো ?'

বিভা ময়দা আনিয়া উহাদের সামনে বসিয়া হাসিয়া বলে '—কি খবর—'

নারাণ আবার বড় বৌয়ের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলে। 'এই বলছি রাঁধার কথা,—বলি রাঁধাও আছে আবার রাঁধাও নেই,—রাঁধতে হয়, লুচী, মাংস, চপ, কাটলেট,—টোষ, স্যাণ্ড উই—না-কি—'

বিভা ময়দায় জল দিয়া মৃদু হাসিয়া বলে— টোষ্ট, স্যাণ্ড-উইচ। নারাণ—বঁটীতে আলু রাখিয়া বলে—'হঁা, ভাই,—আমরা মুখখু-সুককু মানুষ ও সব মুখে আসে না—ও সব তোমাদেরই সাজে —তুমি, নমিতা—।'

ইহার মাঝে বড় বৌ ও নারাণের মাঝে—কি যেন দৃষ্টি বিনিময় হইয়া যায়,—নারাণ,—বঁটী হইতে চোখ না তুলিয়া আলু কাটিতে কাটিতে—বলিয়া যায়—

'তোমার ভাগ্য তাই,—নয়ত তুমি ওর চাইতেও আদর পাবার যোগ্য—

কথার শ্লেষটুকু কাহারও অজানা থাকে না,—বিভা ময়দা মাখিতে মাখিতে অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠে,—বড় বৌয়ের মুখ কৌতুক-হাসি চাপিতে গিয়া—বিকৃত হইয়া ওঠে,—নারাণ—বেপরোয়া বলিয়া চলে—

'ভাগ্যের কথা নয় ত কি,—নমিতা কি এমন সুন্দরী—কি এমন এস্‌টাইল—বলো,—তোমার কাছে এখনও দু'দশ বছর শিখতে পারে, তবু মেজবাবু তাকে যে কি চোখেই দেখ্‌লো !'

বিভা মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল—'তা'র নিজের বউকে তোমরা ভালবাসতে বারণ করো নাকি ?'

'আমরা বারণ করবার কে ?'—নারাণ রাগিয়া বলিল—'বারণ আমরা করিনে,—কিন্তু তোমায়ও বলি রাঙাদি,—কিসের বউ,—কার বউ,—? বলতে গেলে বলবে তোমার ছোটনোকের মুখ,—থাক্—'

বঁটী হইতে হাত নামাইয়া নারাণ বলিয়া চলিল—'বিয়ে ত হ'য়ে গেছে আজ দু'মাস হবে,—বৌয়ের কি ব্যবহার পেয়েছে মেজবাবু ওর কাছ থেকে ? এক বিছানায় শোবে না বলে মাঝে বালিশ দেওয়া হ'ত,—তাই আবার দু'খানা ছোট খাট কেনা হ'ল,—'খে আগুন,—আমি হ'লে দিতাম—'

বড় বৌ মীনার মুখে আর এক চামচ দুধ-বার্লি দিয়া বলিলেন—

'ঠাকুরপোরও এবার বিয়ে করে ভীমরতিতে ধরেছে,—অত নেই দেওয়া কিছুতেই ভাল হচ্ছে না।'

'তুমি কি বলো,—বড় বৌদি,—নিত্য নোতুন ভেট আসছে,—সাবান, এসেন্স, পাউডার, সাহেবী কায়দায় সব দেরাজ আলমারী,—আবার শুন্‌ছি না কি মেম রেখে পড়ানো হবে—গান শেখানো হ'বে।'

বিভা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ছিল,—বলিল,—'কেন বাংলা গানে আর চল্‌লো না কি ?'

'না'

অনেকক্ষণ কেহই কিছু কথা কহিল না, পরে বিভা বলিল—'মেম রাখা হ'বে তোমরা কার কাছে শুন্‌লে ?'

রেখা মায়ের পাশে বসিয়া ছিল বলিল—

'নোতুন কাকীমাই বল্‌ছিলেন—এখানে পড়াশুনার সুবিধা নাই,—ভাল লাগে না—'

'তাতে মেম রাখা হবে কে বল্‌লে—?'

'কাকা বলেছেন—বন্দোবস্ত করে দেবেন।'

'হুঁ'—বলিয়া বিভা ময়দার নেচী তৈয়ার করিতে লাগিল।

মীনার দুধ-বার্লি খাওয়ানো শেষ করিয়া তাহাকে কোলে নাচাইতে নাচাইতে বড়বৌ বলিলেন—

'কেবল ফ্যাসান্‌, বাবুয়ানা, চা'ল। এই যে এতদিন এসেছে,—কই একদিন ত বল্‌লে না—এইটা তোমাদের রান্না করে খাওয়াই,—মীনাকে দাও একটু আমার কোলে, মেয়ে কি আমার এতই ঘিন্নিৎ যে সুন্দর রঙ কালো হয়ে যাবে !'

বিভা ময়দা রাখিয়া বলিয়া উঠিল—'এ কিন্তু তোমার অন্যায় কথা দিদি, মীনাকে সে নিতেও চায়, নিয়েওচে, তুমি-ই তার কাছে দিতে চাও না,—লেখা ত সারাদিন তার কাছেই আছে—'

ঠোঁট ওলটাইয়া বড় বৌ বলিলেন—'গোল্লায় যাবে মেয়েটা,—বিবিয়ানা শিখ্ছে যত,—বল্লেও শুন্বে না,—কি বিষ-মন্তর কানে দিয়েছে কে জানে।'

বিভার কাছ থেকে একটু ময়দা লইয়া গুলি পাকাইতে পাকাইতে রেখা বলিল—'কাকীমা বলেছে আমায় এস্‌রাজ শেখাবে।'

বড়বৌ তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—'আর কাজ নেই এসরাজ শিখে, গানই কত শিখেছ,—প্রভাত একটা গান শিখালে সাত দিনে তার সুর ধরতে পারো না,—আবার এসরাজ! সেদিন হারমোনিয়ম্ কিনিয়ে আমার এতগুলি টাকা নষ্ট করলে,—আবার এসরাজ,—টাকা আর গায়ে ধরে না!

'কাকীমার এসরাজেই শিখাবে বলেছে—'

'না, খবরদার ওর এসরাজে হাত দিও না।'

'কেন হাত দিলে কি হয়?'—বলিয়া নমিতা লেখার হাত ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে তার মৃদু কৌতুক হাসি। মুহূর্ত্তের জন্য বড়বৌ ও নারাণের মুখে একটু সঙ্কোচের ছায়া পড়িল। তারপর—বড়বৌ সহজ হইয়া বলিলেন—

'কি ভাগ্যি,—দেবীর আজ মর্ত্তে আগমন হ'ল।'

সদ্যস্নাত নমিতার গা হইতে সাবান ও পাউডারের একটী স্নিগ্ধগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল,—বিভা একটু ঠাট্টা করিয়া বলিল—'সঙ্গে আনিল কুসুম-বাস—'

নমিতা বালিকার মত হাসিয়া উঠিল। এত সহজ ব্যবহার এখানে আসিয়া সে কোনও দিন পায় নাই। কত কাল পরে আবার যেন সে ছাত্র-জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে। নমিতা দাঁড়াইয়া ছিল দেখিয়া নারাণ রেখাকে বলিল—

'তোর কাকীমাকে একখানা পিড়ী এনে দে না, হাবা মেয়ে—'

রেখা বড় হইয়াছিল,—নারাণের হুকুম শুনিয়া সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল,—তাহার এখন সম্মান জ্ঞান হইয়াছে। সকলেই খালি মেঝেয় বসিয়াছিল,—নমিতা বলিল—'থাক্,—আমি এই এখানেই বস্‌ছি,—বলিয়া জায়গাটা আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া লইল।

নমিতা স্থির হইয়া বসিলে,—বিভা লুচি বেলিতে বেলিতে বলিল 'তোমার শরীর আজ কেমন নমিতা ?'

'এক রকমই,—মাথার চাপ একটু বেড়েছে'

'তোমার আবার অসুখ না কি ?'—বড় বৌ বলিলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে নারাণের সহিত চোখে চোখে হাসির বিনিময় হইয়া গেল।

'হাঁ,—সামান্য'—নমিতা বলিল।

'কি'

'ব্লাড প্রেসার।'

নারাণ বুঝিতে না পারিয়া চোখ মেলিয়া রহিল।

বিভা স্বরে একটু দরদ্ মিশাইয়া বলিল—

'এই বয়সে 'ব্লাড প্রেসার',—এ তো বড় মুস্কিলের কথা !'

নমিতা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

'তোমার মা বাপের ছিল কোন দিন ?'

'কই শুনি নি ত কোন দিন ?'

'এর আগে আর টের পেয়েছ ?'

'মনে পড়ে না।'

নারাণ ও বড়বৌ চোখে চোখে বলিল—আরও কত অসুখ হবে,—কত ঢংই দেখব !

লেখা নমিতার হাত টিপিতেছে—বলিতে চায়—'কই বল্‌লে না ?'

নমিতা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া শান্ত করিয়া বিভার দিকে তাকাইয়া বলিল—'কই আপনি ত আর কা'ল গেলেন না ? প্রভাত ঠাকুরপো কিছুতেই হার স্বীকার করেন না,—আপনি মধ্যস্থ হবেন,—আবার আমাদের তর্ক হবে—'

বিভা হাসিয়া উঠিল—

'বেশ লোক ঠাওরেছ যাহ'ক—কি জানি ভাই, আমি ?'

বড় বৌ অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিলেন, মীনাকে কোলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লেখা আবার নমিতার গা টিপিল।

বড় বৌ যাইতে উদ্যত হইয়াছেন,—নমিতা বলিল—

'দিদি একটু দাড়ান !'

'আমায় বলছ ?'

'হাঁ'

বিস্মিত মুখে বড়বৌ ফিরিয়া দাঁড়াইতে,—নমিতা বলিল 'আমার শরীরটা ভাল না,—একটু বেড়াতে বেরুব, গাড়ীতে প্রভাত ঠাকুরপো যাবে,—ওর আজ কি কাজ আছে।—লেখা যেতে চাইছে—যাবে ?'

মুহূর্ত্তে বড় বৌয়ের মুখ হইতে সমস্ত সরসতা তিরোহিত হইল,—'লেখা যাবে—কোথায় যাবে? পড়াশুনা নেই তার? সারাদিন ফ্যাশান্ শিখে বেড়ালে কি চলে—তোমার মত ভাগ্য যে সবাই ক'রে এসেছে,—এমন কি কথা আছে, কেমন ঘরে গিয়ে পড়ে তার ঠিক্ কি?'

নমিতা অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল। বড়বৌ বলিয়া চলিলেন—'তুমি আসা অবধি লেখাপড়া ত চুলোয় গিয়েছে!'

লেখা নমিতার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—এইবার জোর গলায় বলিল—'পড়েছি ত আমি, রোজই ত পড়ি কামীমার কাছে—'

'কেন প্রভাত কাকার কাছে পড়তে কি হয়?—যেমন হয়েছে প্রভাত!—আজকাল একটী সন্ধ্যায় তার পাত্তা পাবার জোটী নেই।'

নমিতা লেখার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—

'লক্ষ্মী তুমি,—আজ থাক, মায়ের মত নিয়ে আর একদিন যেও আমার সঙ্গে—কেমন?'

লেখা এ সান্ত্বনার ফলে সুরের মাত্রা বাড়াইল মাত্র।

নমিতা কি করিবে বুঝিয়া উঠিতেছিল না,—এমন সময় নরেন আসিয়া তাহাকে মুক্তি দিল—

'নাও,—আর দেরী করো না, ওরা সব তৈরী হয়ে বসে আছে—'

নমিতা এ সুযোগ উপেক্ষা করিল না,—লেখাকে কাঁদাইয়া বড়বৌকে জ্বালাইয়া—নরেনের পিছু পিছু উপরে চলিয়া গেল।

নারাণ অবাক্ হইয়া বড়বৌয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, বড়বৌ তাহার উত্তরে শুধু বলিলেন—'দেখেছ!'

কথাটা নিতান্ত ফেলিবার নহে।

বৌয়ের মন পাইতে নরেন যাহা আরম্ভ করিয়াছে তাহা দেখিবার মত কথাই বটে।

শোবার ঘর নূতন হইতে আরম্ভ করিয়া নূতনতম আসবাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

পুরাতন বড় খাট সরাইয়া নূতন দুইখানি ইংলিশ খাট ঘরের মাঝে পাশাপাশি রাখা হইয়াছে, তাহাতে ঝালর দেওয়া নেটের মশারী—। ইহাতে অনেকে হাসিয়াছে নরেন তবুও গ্রাহ্য করে নাই।

লেখার জন্য ছোট্ট একটী সেক্রেটিরিয়ট্,—তা'তে রাইটিং প্যাড্, পিনকুশান, পেপার ওয়েট,—শেলের আধারে একটী স্কাইব্লু পার্কার,—যেন ছোট্ট একটী আফিস্।

ইজি চেয়ারের পাশে ওয়াট্‌নটে ইংরাজী বাংলা নভেল—খ্যাতনামা লিখিয়েদের। উপরে অসংখ্য ম্যাগাজিন্, তাদের কভারে নানা রঙের সুদৃশ্য ছবি।

ঘরের কোনে সুন্দর একটী ড্রেসিংটেবল্,—তা'তে দেশী বিদেশী নানাবিধ সুগন্ধি প্রসাধন। আর এক কোনে ডোয়ার্কিনের বাড়ীর একটী দামী অর্গান। দেওয়ালে নানাদেশীয় বিখ্যাত রূপ-দক্ষের আঁকা ছবি।

দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—মানুষের মন পাইতে মানুষকে

কত না তৎপর হইতে হয়। দেবতারও হয়ত মন গলে—তবু মানুষের গলে না।

একদিনের কথাই বলি।

বৈকাল হইতেই মেঘ করিয়াছিল,—সন্ধ্যায় এক পশলা হইয়া গিয়াছে,—আকাশের আঁখি তখনও ছলছল।

নরেন বাড়ী ফিরিয়া আসিল একটু সকাল সকাল। এমন দিনে কাজ ভাল না লাগিলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

নমিতা একখানা বই হাতে করিয়া চোখ বুজিয়া ইজি চেয়ারে শুইয়া ছিল। নরেন পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া দেখিল নমিতার হাতে রবি বাবুর 'শেষের কবিতা'।

ধীরে ধীরে চোখে হাত দিতে নমিতা চোখ মেলিল।

এমন বাদল-দিনে অসম্ভব হইলেও হয়ত নরেন মনের কোণে একটু কিছু আশা করিয়া থাকিবে, কিন্তু নমিতা জড়ের মতই নিস্পন্দ,—ও চোখে নরেন আনন্দ বিস্ময় লজ্জা ঘৃণা কিছুরই আভাষ দেখিল না।

নরেন পাশের চেয়ার টানিয়া বসিতে,—নমিতা উঠিয়া বসিল—যেন সে সজাগ থাকিতে চায়।

'ঘুমিয়েছিলে?'

'না'

'তবে?'

নমিতা কোন উত্তর দিল না। নরেন ধীরে ধীরে নমিতার বাঁ হাতে হাত রাখিল, নমিতার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, নড়িল না।

'তুমি কি চিরকালই এমনি কাটাবে না কি ?'

নমিতা জিজ্ঞাসুনেত্রে নরেনের দিকে তাকাইল।

নরেন ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—

'শুনেছি ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে নির্ম্মম পাষাণের কাছ থেকেও সাড়া পাওয়া যাও,—কিন্তু তুমি কি !'

নমিতার দুই চোখ ফাটিয়া জল আসিল, কিন্তু তাহার মুখ একটুও নড়িল না, ওষ্ঠ একটুও কাঁপিল না।

এই মেয়েটির ব্যবহার নরেনের কাছে প্রথম হইতেই দুর্ব্বোধ্য, কাছ থেকেও এ কত দূরে,—তাহার এ অদ্ভুত আচরণ প্রতিদিনই তাহাকে রহস্যময়ী করিয়া তুলিতেছে।

নরেন অকস্মাৎ এ অশ্রুপাতের কারণ বুঝিল না। সে ত তাহাকে কোন ব্যথা দেয় নাই, কোন কটু বলে নাই, বরং নিজের বেদনার কথাই ভক্ত-পূজারীর মত নিবেদন করিতে চাহিয়াছে। নরেন আর একটু অপেক্ষা করিল—তারপর নমিতার হাত থেকে নিজের হাত তুলিয়া ধীরে ধীরে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে তখন প্রকৃতির আবার কান্না সুরু হইয়াছে। পথের পারের বাড়ীগুলিতে আলো ঝুলিতেছে, পথের আলোগুলি বড় ঝাপসা। বৃষ্টির কুয়াশায় পথের স্পষ্টতা নিষ্প্রভ হইয়াছে, —মানুষের মনের সহিত কোথায় যেন এর সাদৃশ্য আছে। দূর থেকে একখানা মোটারের হেড্‌লাইট দেখা গেল,—আলো ফেলিয়াছে, সামনে কে যেন—গরীব হবে—ছাতা মাথায় একটী ছেলেকে বুকে আঁকড়াইয়া চলিয়াছে।

যে শাখে ফুল ফোটে না

নরেন বাইরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। সামনে—বাড়ীর পর বাড়ী,—তারপর বর্ষাচ্ছন্ন অস্পষ্ট বনরেখা, দূরে ঘন তমসাচ্ছন্ন রজনীর অজ্ঞেয় রহস্যাবৃত নীলাকাশ, যুগ যুগ ধরিয়া সর্ব্বলোক চক্ষু অন্তরালে নিজের বেদনার ইতিহাস যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

নরেন সেদিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিল—কে জানে, হঠাৎ ছোট একটা শব্দে ফিরিয়া দেখিল নমিতা বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেন?—সে কি কাছে আসিয়া কোন সান্ত্বনা দিতে চায় অথবা—না, নরেন আর ভাবিতে পারে না, সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া নমিতার হাত ধরিয়া বলিল—'বসো।'

তারপর চেয়ার টানিয়া নিজে বসিল।

আজ সে একটু ভাল করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লইতে চায়। নমিতা একখানা বিলাতী ম্যাগাজিন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। নরেন তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল—ওর দুর্জ্ঞেয় মনের যদি একটুখানি ও ধরা পড়ে এই আশায়।

নমিতা ম্যাগাজিনের পাতা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—

'হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেলে না?—আফিস থেকে এসে ত এখনও জামাও ছাড়ো নি।'

নরেন একটু হাসিল,—বড় দুঃখেও না কি লোকের হাসিআসে!

'আমার খাওয়া আর না খাওয়ার খবর রাখা কি তোমার কর্ত্তব্য বলে মনে কর?'

মুখ না তুলিয়াই নমিতা বলিল, 'প্রত্যেকের খাওয়া না খাওয়ার খবর রাখাই কর্ত্তব্য।'

'ও !'

কিছুক্ষণ আর নরেনের বাক্য-স্ফূরণ হইল না।

এর পর কথা নমিতাই কহিল, 'অনেকক্ষণ এসেছ, জামা ছেড়ে কিছু খাও।'

স্বরে সত্যই বুঝি একটু মমতা ছিল,—নইলে নরেন হঠাৎ এমন কথা বলিত না—

'দেহই লোকের সব নয় নমিতা,—মন বলেও একটা জিনিষ আছে—এবং তার ও নাকি ক্ষুধা আছে, সে ক্ষুধা কি আমার কোন দিনই মিট্‌বে না ?'

নমিতার মুখ চোখ আবার নির্ম্মম হইয়া উঠিল, নরেন সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিয়া চলিল—'তুমি একদিন বলেছিলে—মানুষের জীবনে কর্ত্তব্য সব চাইতে বড়—তোমার কি কোন কর্ত্তব্য নেই,—তোমার আর আর কর্ত্তব্য তুমি ঠিক মতই কর জানি,—কিন্তু আমার প্রতি ?' নমিতা তবুও কোন উত্তর করিল না, নরেন একটু থামিয়া আবার বলিল—

'রাঙাবৌ বলেন রন্ধনে তুমি দ্রৌপদী,—রূপে গুণে বিদ্যায় ব্যবহারে তুমি নাকি অনবদ্য, চেষ্টা করলে আদর্শ স্ত্রীও তুমি হ'তে পারতে।' এ কথার উত্তরে নমিতার চোখ দুটী আবার সজল হইয়া উঠিল, এবং তাহা গোপন করিতে সে আবার ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইল। এমন সময় রজনী আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—

'বাবু !'

'কিরে ?'

'রাঙাদি বলছেন, বাবু ত অনেকক্ষণ এসেছেন, এখন তার জল খাবার দেব কি ?'

নরেন একটু হাসিয়া বলিল—'আচ্ছা, যা দিতে বল, আমি যাচ্ছি—'

প্রকাশ বাবুর ঘর থেকে রেখার সুর কানে আসিল, প্রভাতের সঙ্গে গলা মিলাইয়া সে গাহিতেছে—

আজ আকাশের মনের কথা
ঝর ঝর বাজে
সারা প্রহর আমার হৃদয় মাঝে—

সেদিন রাত্রে আকাশের মনের কথা আর শেষ হয় না। তাহার অশ্রান্ত কথা শুনিতে শুনিতে নিজের মনে কত কথা জাগিয়া ওঠে—কত ব্যথা, বলিবার সাথী মিলে না। বাদলের ধারার লেখায় বাহিরের জগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ দিনে যে জগৎ জাগে সে আমাদের নিজেদের স্বপ্নে গড়া—সুখ-দুঃখ চাওয়ার,—কল্পনার।

বিভা যত কিছু কাজ ছিল শেষ করিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র শয্যাটি আজিও মায়ের মত ব্যগ্র-স্নেহে দু'বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে, বিভা আজ আর তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল না। প্রাণহীন নীরব বন্ধুটির কাছ থেকেও কোন কিছু গ্রহণ করিতে আজ তার অন্তরে বাধে। সমস্ত জগতের উপর, বিধাতার বিধানের উপর দারুণ অভিমানে নিজেকে সে একেবারে রিক্ত করিতে চায়। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কতক্ষণ সে দাড়াইয়া আছে,—এতক্ষণ সে কি ভাবিয়াছে? হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়িতে দেখিল ১১টা বাজিয়া ৫; তা' বাজুক, আজ তার শয়নে সাধ নাই। বিভা পূবের জানলা খুলিয়া দিল,—বাহিরে তখন বাদল নটীর নৃত্য চলিতেছে—ঘন কুয়াসার আস্তরণে রহস্যময়ীর অপরূপ ছন্দ—মানুষের মনে কাজের দিনে ভোলা ব্যথা জাগাইয়া তোলে।

ভালো লাগে না।

যে শাখে ফুল ফোটে না

বিভা জানালা বন্ধ করিয়া কি ভাবিয়া খাটে আসিয়া বসিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর নিজের শ্রান্ত দেহটাকে শয্যায় ঢালিয়া দিতে ওর পরম তৃপ্তি, প্রাণহীন বন্ধুর বুকে পায় ও বুকঢালা ভালবাসা। আজ কিন্তু সেও ওকে টানিল না। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর মাথার চুল খুলিয়া দিল। দেখিল,—বেশ ভাল করিয়াই দেখিল—ওর চুল এখনও কোমর ছাড়াইয়া পড়ে,—দু'হাতে মুঠা করিয়া ধরা যায় না। বিভা আজ বড় ছেলে-মানুষ হইয়াছে, চুল উল্টাইয়া চোখে মুখে ফেলিয়া দেখিল—ওর দৃষ্টি আজও তেমনি কেশের ঘন কৃষ্ণ আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে যাইতে পথ পায় না। ঘরে কেহ ছিল না,—তবু ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। বিভা নিজের গালে হাত রাখিল, ওর গাল এখনও নরম তুল্‌তুলে, ঠোঁট দুটি বুঝি এখনও রাঙা টস্‌টসে। রেশমের মত সূক্ষ্ম কোমল ঘনায়ত দুটী ভ্রূতে হাত বুলাইতে বুলাইতে ও আয়নার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সাড়ে পাঁচ ফুট দীর্ঘ আয়নায় ওর সারা দেহের প্রতিবিম্ব পড়িল।—দেহে যৌবনের জোয়ার তেমনি অটুট রহিয়াছে,—দীর্ঘ টিকল নাকটীর পাশে দুইটী কৃষ্ণ চক্ষু যেমনি গভীর তেমনি বিহ্বল। হাত দুটী তেমনি সুডোল—দেহের প্রতি রেখা যেন আরো সুস্পষ্ট, আরো সজীব।

বিভা আয়নায় বারবার আজ নিজের রূপ তাকাইয়া দেখিল,—আশ্ আর মিটে না। পাশের তাকে স্নো, পাউডার, সাবান সাজানো রহিয়াছে, বিভা কতদিন সে সব স্পর্শ করে না, অথচ এ না হইলে তার এক সন্ধ্যা চলিত না।

আজ কি করিলে যে ভালো লাগে—না বুঝিয়া বিভা রাত্রেই মুখে সাবান দিয়া কিউটিকিউরা পাউডার লাগাইল, তারপর দিনের কাপড় ছাড়িয়া একখানা ধোপদুরস্ত শাদা কাপড় পড়িল, বিছানার চাদর বদলাইল।

মন খারাপ হইলে সে একটু ভালো করিয়া প্রসাধন করে। সে বিধবা বলিয়া ইহাতে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে।

তা হ'ক,—সে গ্রাহ্য করে না। ইহাতে পাপ সে দেখিতে পায় না। নিজেকে সুন্দর করিয়া তোলায় পাপ কোথা?

আজ এক গাছা বেলের মালা পাইলে সে পরিত—কে আর দেখিত?

ভাবিতেই বিভার কেমন হাসি পাইল—সে এখনও সমাজকে ভয় করে না কি? কেন? কিসের ভয়? সমাজ তাহাকে কি দিয়াছে?

মনটা বুঝি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। বিভা আয়নার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল,—দেখিল মুখে কঠোরতার ছোপ পড়িয়াছে—সে এসরাজ লইয়া বসিল।

প্রভাত বলিল 'অন্যায় আমি একটুও করি নি রাঙাবৌদি,—আজ যদি সারারাত আপনি বাজাতেন, আমি সারারাত আপনার দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌তাম,—একটুও কষ্ট হ'ত না আমার। এমন বাজনাও আপনার শুনিনি আমি—বিশ্বের বেদনা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল আপনার সুরে।'

বিভা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এসরাজটা রাখিল।

'কিন্তু আপনি যদি অমনি গম্ভীর হয়ে থাকেন, তা'লে আমি কথা বলব কি করে।'

বিভা একটু মৃদু হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল—'এত রাতে তুমিও জেগে আছ?'

প্রভাত দেখিল—রাঙা বৌদি আজ অন্যদিনের সহজ মানুষটী আর নাই, ইহার সহিত কথা বলিতে হইলে অতি সন্তর্পণে বলিতে হইবে। প্রভাতের কেমন বাধো বাধো লাগিতেছিল। বিভা হয়ত বুঝিল, বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—'তোমার একটু আশ্চর্য্য লাগছে—না প্রভাত,—আজ আমি এত রাতে এমন করে সেজেছি? এমন বাদল-রাতে যখন কেউ কাছে থাকে না—ঘরের এক কোনে বসে নিজেকে এমনি করে সাজিয়ে তোলার ভেতর কিসের সাড়া পাও, বলো না! রাঙাবৌদিকে আজ থেকে হয়ত তুমিও শ্রদ্ধা করতে পারবে না, নয়?'

প্রভাত উত্তর দিল না, শুধু একদৃষ্টে বিভার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিভা তবুও হাসিয়া বলিল—'কেমন, সত্যি কি না?'

প্রভাত বলিল—'আজ আমায় পর করে এখনই ঘর থেকে বের করে না দিলে কি আপনি কিছুতেই সোয়াস্তি পাবেন না।'

অকস্মাৎ একটী সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া বিভা প্রভাতের সারা মনটাকে একেবারে স্নান করাইয়া দিল।

বিভার দৃষ্টি থেকে চোখ নামাইয়া প্রভাত বলিয়া চলিল— 'আজ আপনার মন একটুও ভালো নেই একথা আমি বুঝি,—

কিন্তু তাই বলে ফিরে যেতেও ত আপনি আর কোন দিন এমনি করে বলেন নি!'

বলিতে গিয়া প্রভাতের চোখ বুঝি একটু সজল হইয়া উঠিতে চায়। বিভা প্রভাতের কাছে আসিয়া এলো চুলগুলি নাড়িয়া, ললাটে হাত দিয়া বলিল—

'রাগ করে না, পাগল! ফিরে যেতে তোমায় আমি একটুও বলি নি। এত রাতে যখন তুমি এসেছ, তখন তোমার বলবার কথা আছে জানি,—আর বাদল রাতের সে কথা যে কি হ'তে পারে তা'ও ত আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি ভেবে আশ্চর্য্য হই প্রভাত,—নিষ্ঠুর দেবতা কি কাউকে বাদ দেয় না!'

খাটের নীচে মাটীতে বিভার পায়ের কাছে বসিয়া প্রভাত নিজে কোঁচার কাপড়ে অসম্ভব মনোনিবেশ করিল। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রভাত বলিল —'আজ আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেল—রাঙাবৌদি, আপনার বেদনাকে অস্বীকার করে—আমার নিজের বেদনার সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছি—কত স্বার্থপর আমি!—কিন্তু আর না—আমি এখন আসি।' প্রভাত উঠিতে যাইতেছিল, বিভা তাহার হাত ধরিয়া বলিল—'যেও না,—বসো,—এমনি করে গেলে আমাকে দোষী করা হয়,—বোঝ না?'

প্রভাত জিজ্ঞাসু নেত্রে বিভার দিকে চাহিল। বিভা বলিয়া চলিল 'কারো ব্যথা একটুও ঘুচাতে পারি এমন গর্ব্ব আমার এতটুকুও নেই,—কিন্তু গোড়ার একটুখানি অসাবধানতায়

জীবনটাকে বিষে ভরিয়ে নেবে, এমন যেন কখনও না হয়, ভাই।'

নিবিড় বেদনায় বিভার সুন্দর মুখখানা নিবিড় মেঘের মতই কালো হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভাত সেই মুখ হইতে শুনিতে থাকিল—'জীবনের পথে যারা আগে যাত্রা সুরু করেছে—বিত্তার সম্বল তাদের হাতে পর্য্যাপ্ত না থাকলেও দুর্গম পথের কষ্টের ইতিহাস—শুধু তাদের মনে নয়,—দেহের বিন্দুতে বিন্দুতে লেখা হইয়া আছে। তাদের যদি নতুন যাত্রীকে কিছু বলবার অধিকার থাকে, তবে বলব—তোমাকে আপন ভাইয়ের মত ভালবাসি বলেই বলব,—সম্ভব হলে তুমি এ বাড়ী থেকে পালাও।'

প্রভাত একটীও কথা না বলিয়া বিভার কোলের উপর মাথা রাখিল। বিভা ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রভাত বলিল—'আমি এখনও ত কিছু বলি নি, রাঙাদি।'

বৌদি উঠাইয়া দিদি বলায় সম্বন্ধ বুঝি আরও একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, বিভা একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—

'তুমি না বললেও আমি সব বুঝি।'

'অন্যায় ত আমি কিছু করি নি, মনের গোপন-কোনেও ত একটু পাপ খুঁজে পাই না আমি!'

'অন্যায় তুমি কিছু করো নি, প্রভাত,—করতে পারো না।'

'তবে?'

'নির্ম্মল ভালবাসায় পাপ নাই, কিন্তু ব্যথা আছে,—আর

সে ব্যথা পাপের যন্ত্রনার চাইতেও ভীষণ। পাপের যন্ত্রনার হয়ত শেষ আছে কিন্তু এ ব্যথার আর শেষ নাই।'

প্রভাত বিভার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল—মুখখানা বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে,—এতদিন যাহা অতি কষ্টে লুকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে,—আজ তাহা প্রকাশের পথ খুঁজে।

প্রভাত বিভার কোলের উপর মাথাটা আবার রাখিয়া ডাকিল—'দিদি!'

'ভাই!'

নীরব আশীর্ব্বাদের দু'ফোটা জল বুঝি প্রভাতের মাথার উপর পড়িল।

সেদিন কাহারও আর কিছু বলা হইল না। বাহিরেও তখন একটা বিরাট কান্নার লীলা চলিতেছিল।

রান্নাঘরের বারান্দা রোদে ছাইয়া গিয়াছে,—অথচ বিভার দেখা নাই। নারাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকাশ বাবুর বড় ছেলে আশিসের জন্মদিন,—দু'চারজন লোকও খাইবে। কুটনা কুটিতে নারাণ একা পারিবে কেন?

সকালে দু'বার বিভার দরজা বন্ধ দেখিয়া নারাণ ফিরিয়া আসিয়াছে। বেলা ৭টা বাজিতে চলিল, তবু বিভা মুখ ধুইয়া আবার ঘরে ঢুকিল। এইবার আর নারাণের সহ্য হইল না—

'কি মেয়ে মানুষই জন্মেছে বাবা, একেবারে অছেদ্দা ধরিয়ে দিলে!'

বড় বৌ মীনাকে কোলে লইয়া বার্লিতে দুধ মিশাইতেছিলেন, তাহার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া নারাণ বলিল—

"দেখলে,—দেখলে একবার রকমটা, তোমরাই ত নষ্ট করলে, নইলে এত সব নবাবী কোত্থেকে আসে? বলি—যার শিল, তার নোড়া—তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া। ছেলেটার আজ জন্মদিন,—একটা ভাল মন্দ আছে ত!—বিবির সে দিক খেয়ালই নেই—মুখখানা করেছে যেন—'

মীনার মুখে এক চামচ দুধ বার্লি দিয়া বড়বৌ বলিলেন—পোড়া কপাল আমার!—কা'ল সারারাত কান্না হয়েছে—তাও বুঝি বুঝিস না।'

নারাণ বঁটি থেকে হাত তুলিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল—'কি করে জানব বলো—এ বাড়ী হ'য়েছে যেন একটা থিয়েটার—'

বড়বৌ একটু হাসিয়া বলিলেন—'যা বলেছিস!—কাল রাত্রে উনি কি কারণে বাইরে গিয়েছিলেন—রাত তখন দেড়টা হবে,—বল্লেন প্রভাত না কি তখন চোখ মুছতে মুছতে বিভার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নারাণ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল্—'ও মা, সে আবার কি!'

'এ অবশ্য কিছু নয়, রাঙাবৌ আর প্রভাতে সে রকম কিছু হ'তে পারে না,—দু'টীতে বড় ভাব—হয়ত মনের কথা বলতে গিয়েছিল—দরদী কি না!'

বেগুনে একটী পোঁচ দিয়া নারাণ বলিয়া উঠিল—

'হবে না! দু'টীই পর গাছা যে!'

'একদিন এই রাঙাবৌ কি কম ভাবিয়ে তুলেছিল! ভাবলাম এ সোনার সংসার বুঝি ছারে-খারে গেল।'

'কিন্তু ধন্যি বুকের পাটা,—নিজে হাতেই ত আবার বিয়ে দিয়ে আনলে,—আবার সেই বউ নিয়ে ও আবার সাধ আহ্লাদ করে,—নতুনবৌয়ের একটু নিন্দা সইতে পারে না, কি পাষাণ বুক—মাগো!'

বড় বৌ একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন—

'থাম্,—তুই বুঝবি ওর মনের কথা,—বিয়ে ও দিতে চেয়েছে! তুই ও যেমন, পারলে ছোঁ মেরে নিয়ে আর্য্য সমাজে গিয়ে তখুনি বে করত। জানিস না কত দুশ্চিন্তায় দিন কেটেছে আমাদের।

উনি ত ভেবে ভেবে একেবারে সল্‌তে সারা,—মাঝে মাঝে এমন উপায়ের কথা বলতেন যে আমি ত ভয়ে মরি, মুখ চেপে ধরে বলি—'অমন কথা বলতে নেই,—পাপ হবে।'

বিস্ময়ে নারাণ চোখ কপালে তুলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তারপর বলে—

'আচ্ছা, নতুনবৌ কি এর কিছু জানে?'

'কি করে আর জানবে?'

'যদি জানত, তা'লে—কি রকমটা হ'ত বলো দেখি!'

দুধের চামচ ঠোঁটে লাগিয়া মীনা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে দোলাইতে দোলাইতে বড় বৌ বলিলেন—

'ছাই হ'ত! নতুন বউ স্বামীর তোয়াক্কা—একটুও করে কি না!—তারপর প্রভাতের সঙ্গে যেমন ঢলাঢলি তাতে কোথাকার ঢেউ যে কোথায় দাঁড়ায় তার ঠিক কি!'

নারাণের আজ বিস্ময়ের অন্ত নাই,—নানা ঝঞ্ঝাটে অনেক দিন সে এসব আলোচনা করে নাই, আজ কুৎসার গন্ধ পাইয়া তাহার সকল ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হইয়া উঠিল। সোৎসাহে বড়বৌয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল—'কি রকম!'

বড়বৌ মুখে গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিলেন—'আমরা ত মেজকর্ত্তাকে গোড়া থেকেই বলছি—ঠাকুর পো, অত ভাল না,—বয়সের ছেলে-মেয়ের অত মিশতে দেওয়া কখনও ভাল না, কে কার কথা শোনে! বলে—নমিতার মন ভালো নেই,—সঙ্গী পায় না,—মিশুক একটু, ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, ওর মন ভালো থাকে। আরে পাগল! ঐ ত সর্ব্বনাশের গোড়া। হাঁ,—বুঝতাম তোমার সাথে ভাব জমে

গিয়েছে,—বাঁধন ঢিলে হবার ভয় নেই,—তা হ'লে ও বা কতক! কিন্তু ঠাকুর পো এ করে কি! কোন সাহসে ওকে প্রভাতের সঙ্গে যেখানে সেখানে ছেড়ে দেয়!' লেখা একখানা এলেন্‌বেরীর রাস্ক চিবাইতে চিবাইতে মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারাণ বলিল—'এ সব হয়েচে নতুন চা'ল,—ঢং, নইলে বাড়ীতে কি আর মানুষ নেই, নতুন বৌয়ের কথা বলবার সঙ্গী মেলে না! কাজকর্ম্ম ও তো আছে,—তরকারী কোটা—রাঁধাবাড়া!'

লেখা রাস্কের শেষ অংশটুকু গলাধঃকরণ করিয়া বলিয়া উঠিল—'বাঃ রে! কাকীমা ত রাঁধতেই চেয়েছে—তোমরাই ত দাও না,—সেদিন মাংস রাঁধতে চাইলে যে, রাঁধতে দিলে?—নিজেরাই ত তাড়িয়ে দিলে—আবার নিন্দে করা হচ্ছে।'

নারাণ বলিল 'তুই চুপ কর,—সব জানিস্‌ তুই!'

বড়বৌ তার মেয়েকে তাড়া দিলেন—'তুই থাম'!—তার পর আরব্ধ কাহিনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন—

'পরশু রাত্রে উনি লেকে গিয়েছিলেন, ওঁদের আফিসের অভয় বাবুর গাড়ীতে। বিকালে জলখাবারের নিমন্ত্রণ ছিল,—তারপর মেয়েরা সব লেকে আসতে চাইলে,—ওঁকেও অভয় বাবু জোর করে নিয়ে এলেন। ব্রিজটা ঘুরে দক্ষিণ দিকে এসে আম বাগানের ধারে দেখেন আমাদের গাড়ী, তার ভেতর বসে রয়েছে—আমাদের ড্রাইভার মতিলাল। ওদের গাড়ী থামিয়ে মতিলালকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি যে এখানে!'

ও বল্‌লে—'আজ্ঞে হেঁ, বাড়ী থেকে মেয়েরা বেড়াতে এসেছেন।'

মেয়েরা শুনে উনি ভাবলেন হয়ত সবাই আছে,—আমিও

আছি,—ভালই হ'ল- অনেক দিন ওদের সঙ্গে দেখা হয় না,—দেখা হয়ে যাবে।'

'কোথায় ?'

'মতিলাল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দেখেন প্রভাত আর নমিতা পাশাপাশি বসে আছে,—যে বৌয়ের মুখে আমরা একটুও হাসি দেখতে পাই না,—সেই মুখ হাসিতে ভরে গিয়েছে। উনি কাছে যেতে দুইজনাই চমকে উঠ্‌ল,—ওদের সবার সামনে লজ্জায় ওর একেবারে মাথা কাটা গেল। ওরা কিন্তু একটু নড়েও বসলে না।'

নারাণ হাসিয়া বলিল—'দায় পড়েছে ওদের! মেজবাবুর আস্কারা পেয়ে ওরা কিছু গেরাজ্জি করে না কি—এই সেদিন ঘরটা ঝাট দিতে গিয়ে দেখি দু'জন সামনাসামনি দুই চেয়ারে বসে আছে,—প্রভাত কি এক ইংরাজী বই থেকে সুর করে কি পড়ছে, আর নতুন বৌ হাঁ করে তাই শুন্‌ছে।'

লেখা এতক্ষণ মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল, এইবার কচি মুখে কোপ দেখাইয়া বলিল—'তোমার সব তাতেই দোষ,—পড়াতে আবার দোষ কি ?'

'তুই চুপ কর না, সব তাতেই থাকা চাই মেয়ের—'

বড় বৌ বলিলেন—

'এই ধরো লেখাকে একটু গান শিখাতো প্রভাত, সে সব পাট ত এক রকম উঠেই গেল।'

লেখা জোর গলায় বলিয়া উঠিল—'বাঃ রে! এই ত কালও দিদি গাইলে ভালো-কাকার সঙ্গে।'

নারাণ ঠোঁট উল্টাইয়া জ্র কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'ভাল কাকা!' ভাল কাকা না—ইয়ে, এ বাড়ীর সব নাম শুনে গা জ্বলে যায়। ভাল কাকা, রাঙা বৌদি,—এ বাড়ীতে আর লোক নেই, যত সব ভালো, রাঙা আর সবাই—ছেলেমেয়েদের পর্য্যন্ত যাদু করেছে।'

বড় বৌ পুরাণো প্রসঙ্গ ধরিয়া বলেন—'যাক্, শোন্, যা বলছিলাম। এদের গান শিখাবার তো নাম নেই অথচ নতুন বৌ-এর ঘরে আসর বেশ জমে উঠেছে, আর যে বউ আমাদের কাছে হা করতে চায় না—নিজের ঘরে প্রভাতের কাছে বসে সে ত সুরের ফোয়ারা ছুটায়।'

নারাণ মুরুব্বিয়ানার ঢং দেখাইয়া বলিল—'এ বাড়ীতে শীগগির একটা কিছু কাণ্ড হ'বে,—তুমি দেখে নিও।'

'কি কাণ্ড রে নারাণ?'

নারাণ চোখ তুলিয়া দেখিল—সকালের স্নান সারিয়া ধোপ-দুরস্ত সাদা কাপড় পরিয়া তার সামনে দাঁড়াইয়া বিভা।

নারাণ কোন উত্তর করিল না। বিভা হাসিয়া আবার বলিল,—'কি কাণ্ড বললি না?'

বিভার গায়ে পড়িয়া এত কথা বলিতে দেখিয়া বড় বৌ বিস্মিত হইলেন,—তাকাইয়া দেখিলেন—বিভার জাগরণ-ক্লান্ত চোখ দুটী স্নানের পর রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে কাঁটার সমান ছাড়া মনে হয় না,—তাহার ও ব্যথার কথা ভাবিলে—এত মায়া লাগে কেন?—বড় বৌ ভাবিতে লাগিলেন। মানুষের মনে এত দুর্ব্বলতা কেন? আজ বিলম্বে আসায় যে অল্প মধুর দুটী কথা শুনাইবেন

বলিয়া মনে মনে যুগাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা আর শুনানো হইল না।

কেহ কোন জবাব দিল না দেখিয়া বিভা লেখাকে বলিল, 'যা দেখি দৌড়ে নতুন কাকীকে ডেকে আন, কিছু কাজকর্ম্ম করুক এসে।'

নতুন কাকীকে ডাকার নামে লেখার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল—'বলব তোমার কথা?'

'হাঁ, বলবি যে রাঙা কাকী ডেকেছে,—যা দৌড়ে যা'—বলিয়া বিভা ধীরে ধীরে ভাঁড়ারের দিকে আগাইয়া গেল।

সেদিন উৎসবের শেষে বিভা যখন নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সারাদিন কর্ম্মের পীড়নে যে ব্যথা আত্মগোপন করিয়া ছিল, রজনীর গভীর নীরবতায় সে প্রকাশের পথ খোঁজে। আজ রাত্রে ও চোখে ঘুম আসিতে চায় না। জানালা খুলিয়া বিভা আকাশের দিকে তাকাইল। অযুত তারকা সেখানে নিদ্রাহীন চোখে তারই মত ব্যথার জ্বালায় জ্বলিতেছে,—ওরা যেন কত যুগের কোটী কোটী প্রাণীর ব্যথার রূপ লেখা।

আজ কতদিন পরে বিভা ডায়েরী খাতা আর কলম লইয়া বিছানায় শুইয়া লিখিল—

হে আমার মূক বন্ধু, গোপন-ব্যথার সাথী আমার,—তুমি আমার হৃদয়ের অভিনন্দন গ্রহণ কর। সারা জগৎ যখন ঘৃণায় অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, কোথায় ও একটু সান্ত্বনা—আশার বাণী মিলে না, তখনও তোমার বুকে আমার আশ্রয় মিলে। তুমি আকুল আগ্রহে আমার নিরর্থক জীবনের তুচ্ছ কাহিনী শুনিতে ও কার্পণ্য করো না।

শত দিনের শত উশৃঙ্খল কথাতেও তোমার শ্রবণ তিক্ত হইয়া উঠে না। গোপন বেদনার অশ্রুতে তোমার বুক সিক্ত করিয়া তুলিতে আমার লজ্জা লাগে না। তুমি কথা কও,—বন্ধু আমার, সাথী

আমার, তুমি বলে দাও—আমার শান্তি কোথা। যে নিদারুণ পিপাসা আমার সারা জীবনটা শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে তাহা মিটাইবার বারি কোথা? ত্যাগে সংযমে না কি শান্তি মিলে, আত্ম-নিগ্রহে না কি বাসনার নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু কই, আমার জীবনের সকল সাধ সকল আকাঙ্ক্ষা বলি দিয়াও ত শান্তি মিলিল না। তৃষিত ওষ্ঠের কাছ থেকে যে পানপাত্র নিজহাতে দূরে সরাইয়া দিয়াছি, হৃদয়ের সান্নিধ্য থেকে সরাইয়া যাহাকে বাহিরের আবরণে ঢাকিতে চাহিয়াছি, চির-চাওয়া সেই দুর্লভ আমাকে আজ এমন করিয়া অধীর করে কেন? মনের দুর্ব্বলতাকে আমি ক্ষমা করি না, কিন্তু বলে দাও আমার এ দুঃখ কেন? যে তৃষ্ণা মিটিবার নয় তাহার জ্বালা আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্বালাইয়া দিল কে?

যৌবনের পরিপূর্ণতা আমার দেহের প্রতি দলকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যাহার নয়নপাতে তাদের বিকাশ ধন্য হইয়া উঠিবে আমি স্বেচ্ছায় সে দেবতাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছি—নিজের গলের কৌস্তুভ-মণি আমি নিজ হাতে পরের গলে পরাইয়া দিয়াছি। কিন্তু আজ আমার শক্তি কোথা? জীবনের সকল স্বার্থ বলি দিয়া যাঁহাকে পূজা করিতে চাহিয়াছি—সে ত আমার সম্মুখে রহিয়াছে!

—এই পর্য্যন্ত লিখিয়া বিভা একটু ছেলেমানুষী করিল—কলমটী বিছানার উপরেই ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল 'ছাই আছে!' বিভার ঘনায়ত চক্ষু দুটী কিশোরী বালিকার মত ছলছল করিয়া উঠিল। ঘরে কেহ ছিল না, তবুও বিভা কান্না চাপিতে চেষ্টা করিল। দু'চার ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, তবুও দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া বিভা কলম তুলিয়া লিখিল—

—বন্ধু, আমি ভুল বলিয়াছি, নাই, সে নাই। আমার চিরারাধ্য দেবতাকে আমি চিরকালের জন্য হারাইয়াছি,—সারা জীবনের স্বপ্ন দিয়া আমি যাহাকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলাম,—স্বপ্নের মতই সে আমার নয়ন হইতে মিলাইয়া গিয়াছে, জাগিয়া দেখি তাহার দেহে রহিয়াছে অপরের স্বামী। তাই বুঝি আমার এত দুঃখ, এত বেদনা—এ বেদনা না পাওয়ার নয়—স্বপ্নভাঙ্গার।

প্রভাত দুইটী পদ্ম হাতে করিয়া নমিতার ঘরের সুমুখে দাঁড়াইল। নমিতাকে ঠিক দেখা যায় না, হয়ত এখনই দেখা যাইবে, তার আগে প্রভাত পদ্ম দুইটী ফুটাইয়া লইবে। অতি সন্তর্পণে দলের পর দল মেলিয়া সে পদ্ম দুইটীকে ফুটাইয়া তুলিল। ইহার মাঝে প্রভাত তাহার হৃদয়ের রূপ দেখিতে পায়,—শুভ্র, কোমল, শ্বেত কমলের দলের মতই নিষ্কলঙ্ক সুন্দর তার অনুরাগ,—অর্দ্ধস্ফুট-পদ্ম-গন্ধের মতই মৃদু, শরৎ প্রভাতে দেবী পূজার প্রথম অর্ঘ্যের মত মনোমুগ্ধকর।

প্রভাত ফুল দেয় অতি সন্তর্পণে—যেন ভক্ত-পূজারীর শ্রদ্ধা-নিবেদন। নমিতা গ্রহণ করে আরও সন্তর্পণে—আবেশে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসে,—যেন তার অন্তর বলিতে চায়—'হে পূজারী, ধন্য—তোমার পূজায় আমার অন্তর আজ ধন্য হইল।'

বাহিরে ইহার বেশী আর পরিচয় মিলে না।

নমিতার কোন সাড়া নাই, ফুলের দল মেলা এখনও সারা হয় নাই। প্রভাত পাপড়ি টানিতে টানিতে ভাবিতে লাগিল,—প্রথমে ফুল দেওয়ার অনুমতি চাহিতেও কত শঙ্কা জাগিয়াছিল। মনে পড়ে—নমিতা একগোছা কদম ফুল আনিয়া—ঐ টেবিলটার উপর বড় ফুলদানীতে সাজাইতেছিল, প্রভাত ধীরে ধীরে কোণের চেয়ারটায় আসিয়া বসিল, নমিতা কোন কথা কহিল না,—মুখটা পর্য্যন্ত তুলিল না, পরম যত্নে দুইটী ফুল একত্রে

বাঁধিয়া প্রভাতের হাতে দিয়া বলিল—'নিন।' প্রভাতের অন্তর সেদিন আনন্দে কদম কোরকের মতই কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর কত কষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রভাত নমিতাকে বলিয়াছিল—'দেখুন, একটা কথা অনেক দিন ধরে ভাবি,—বলব ?'

নমিতা শুনিবার কৌতূহলে যে দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—প্রভাতের কাছে তাহা আজও বড় উজ্জল হইয়া রহিয়াছে—

'বলুন'

প্রভাত অতি কষ্টে জিহ্বার জড়তা কাটাইয়া বলিয়াছিল—'দেখুন আমি অনেক দিন থেকে ভাবি আপনার জন্য কিছু ফুল আনি, কিন্তু ভয় হয়।'

মৃদু হাসিয়া নমিতা বলিয়াছিল—'কিসের ভয় ?'

'জানি না,—হয়ত কোন দিক দিয়ে কিছু দোষের হতে পারে।'

মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ফিরাইয়া আনিয়া নমিতা বলিয়াছিল 'ফুল ত পূজায় লাগে,—পূজায় পাপ কোথা ? যে ভালবাসা পূজার মত তাতে দোষ কিসের ?'

ভালবাসা !

নমিতার মুখে ভালবাসা শুনিয়া প্রভাতের অন্তর আনন্দে বিবশ হইয়া পড়িল। নিজের হৃদয়ে যে পূজার মুকুল দিনে দিনে বিকশিত হইয়া দেবসৌরভে নিজেকে মাতাল করিয়া তুলিতেছিল—প্রভাত তাহাকে কি নামে ডাকিবে নিজেই ভাল বুঝিয়া উঠিত না,—অতি গোপনে, নিজের মনের কোণে তাকে 'ভালবাসা' বলিতে ভয় পাইত। কিন্তু আজ নমিতা অতি

সহজে কি করিয়া—ভাবিতে প্রভাতের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। একটী কথার ভিতরে আজ তাহার কত বড় সম্পদ মিলিল, এ তাহার কি হইল!

সেদিনের সেই শুভক্ষণের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভাত সমাহিত হইয়া পড়িয়াছিল,—এ দিকে যে নমিতা আসিয়া কখন দোরের পাশে দাঁড়াইয়াছে তাহা প্রভাত দেখিতে পায় নাই, চোখ তুলিতেই দেখিল—নমিতা।

নমিতা মৃদু হাসিয়া বলিল—'একেবারে সমাধি! কাকে ধ্যান করা হচ্ছিল?'

একটী মধুর কুণ্ঠায় প্রভাতের মুখখানা রক্তাভ হইয়া উঠিল,—কোন উত্তর না দিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর আগাইয়া গেল। নমিতা ঘরে আসিলে প্রভাত তাহাকে ফুল দুটী দিয়া চেয়ারে বসিল। লজ্জার আড়ষ্ট ভাব তখনও তাহার কাটে নাই।

ফুল দুটীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে নমিতা বলিল—'কই আমার কথার উত্তর দিলেন না ত?'

'কি কথা?'

'কাকে ভাবছিলেন অমনি করে?'

অতি কষ্টে চোখ তুলিয়া প্রভাত বলিল—'জানেনই ত।'

'কই না, বলেন নি ত!'

অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া চোখ মুখ রাঙা করিয়া প্রভাত বলিল—'আমার মানসীকে।'

একটী নিবিড় লজ্জায় নমিতার মুখের স্বাভাবিক লালিমা নীলাভ হইয়া উঠিল। তবু আরও স্পষ্ট করিয়া শুনিতে সে

আবার জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু এত বড় সৌভাগ্য যে কে লাভ করলে,—তা' ত আপনি কিছুই বললেন না।'

প্রভাত চক্ষু নত করিয়াই বলিল—'তা' ত আপনি জানেনই।'

তারপর ?

তারপর অত বড় ঘরে ওয়াল-ক্লকের একঘেয়ে টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা গেল না। প্রভাত সামনের 'হোয়াট্‌ নট' থেকে ওমার খৈয়াম লইয়া—পাতার পর ছবি, ছবির পর পাতা উল্টাইয়া চলিল। নমিতা ফুল দুইটী তার জয়পুরী ফুলদানীতে কিরূপে সাজাইবে তাহা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল।

কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকিলে হয় ত উহাদের মুখে অনেক কিছুর আভাস পাইতেন।

প্রায় দশ মিনিট পরে নমিতা বলিল—

'ফুল আনতে গেলেই আপনি দেরী করেন,—কতটা সময় বৃথা কেটে যায়।'

প্রভাত বলিল—'বৃথা বললে আমার'পর বড় অবিচার করা হয়, ঐ মুহূর্ত্তগুলিই আমার জীবনে বড় বেশী করে সার্থক হয়ে ওঠে,—মনে হয় এর চাইতে বড় কাজ বুঝি আমার জীবনে আর নেই।'

নমিতা কোন উত্তর দেয় না, শুধু বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রভাতের স্বপ্নোদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

প্রভাত বলিতে থাকে—'ছেলেবেলায় দেখেছিলাম এক

বাবাজীকে তুলসীপাতা তুলতে,—স্নান করে কষায় বসন পরে তুলসীর পাতা তুলছিল অতি সযত্নে। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তার মুখের আকৃতি বদলে গিয়েছিল। পাতার গায়ে ব্যথা না লাগে, একটী বোঁটা ছোট বড় না হয়—সে জন্যে বাবাজীর শঙ্কার অন্ত ছিল না। পা ফেলছিল অতি সন্তর্পণে—পাছে তুলসী-রাণী কোন অপরাধ নেন। বাবাজীর কাণ্ড দেখে বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন আমিও হেসেছিলাম,—কিন্তু তা'র ভেতরে যে একটী গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ভাব দেখেছিলাম,—তা' আমার হৃদয়ে সত্যিই গভীর রেখা পাত করেছিল। শুধু—আমাদের ফ্যাসানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে নি বলে আমরা বাইরে তাকে হেসে উড়িয়েছিলাম। আজ আমি বুঝি দেবতার জন্যে ফুল তুলতে তার অত আনন্দ কিসে হইয়াছিল, কিসের সার্থকতায় তার প্রতিক্ষণ মধুর হ'য়ে উঠেছিল।'

উচ্ছ্বাসের আবেগে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়া প্রভাত যেন কত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে। নমিতার দিকে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল—'পাগলের মত শুধু যা তা বলে ফেলেছি—কিছু মনে করবেন না।'

নমিতা বিহ্বল হইয়া একবার প্রভাতের দিকে তাকাইয়া একটী গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

'আপনি সত্যিই ত পাগল!'

আনন্দ-সাগরের আর একটী ঢেউ আসিয়া প্রভাতের বুকে লাগিল।

প্রভাত পরম সার্থকতায় নমিতার চোখের দিকে চাহিয়া বলিল—'সত্যি?'

দৃষ্টিতে গভীর সান্ত্বনা ও মমতা মাখাইয়া নমিতা উত্তর করিল—'সত্যি।'

বুকের মাঝের কাঁপনগুলি তাদের নাচন শেষ করিল প্রায় দশ মিনিট পর।

নমিতা ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল—'এত দেরী করে আসেন কেন? এত রাগ হয় আমার—'

প্রভাত কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল—'কেন, আজ কি কোথায় ও যাবার কথা আছে?'

বাইরে একখানা মোটার হর্ণ বাজাইয়া আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। নমিতা বলিল—'ঐ বুঝি উনি এলেন,—বলেছিলেন সকাল সকাল এসে লেকে বেড়াতে যাবেন।'

'আপনি ও যাবেন বুঝি?'

মুহূর্ত্তের জন্য প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া নমিতা বলিল—'আপনি যেতে পারবেন না?'

এতক্ষণ প্রভাত জগতের কঠিন বিধানের কথা ভুলিয়া স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিল,—সুতরাং এ কথার উত্তর সে সহজে দিতে পারিল না। স্বামী-স্ত্রীর প্রথম জীবনের গোপন মিলনে সে বাধা হইয়া যাইবে কিনা—ভাবিয়া উত্তর দিতে দ্বিধা করিতেছিল।

উত্তর দেওয়া আর হইল না, সিঁড়ীতে জুতার শব্দে নিজের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া নরেন আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনের কাজের ক্লান্তি ও বেড়াইতে যাইবার উৎকণ্ঠায়—তাহার মুখের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য তিরোহিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহা দেখিয়া

নরেনের মনোভাব সম্বন্ধে প্রভাতের ভুল ধারণা করা অসম্ভব নয়।

'কি রে কতক্ষণ এসেছিস'—নরেন জিজ্ঞাসা করিল।

'এই কিছুক্ষণ আগে।'

বলিতে গিয়া প্রভাতের কণ্ঠ একটু কাঁপিয়া উঠে। ওর নিজের উপর রাগ হয়,—কোন অন্যায় ত সে করে নাই, তবে কণ্ঠে এমন জড়তা আসে কেন? কণ্ঠকে যথাসাধ্য সহজ করিয়া প্রভাত আবার বলে—'তা' হ'লে আপনারা লেকে যাচ্ছেন—বউদি বলছিলেন?'

নরেন আফিসের জুতা খুলিতে খুলিতে বলে—'তুই ও চল!'

'না, আপনারাই যান, আমার একটু কাজ আছে।'

কাপড় হাতে করিয়া আফিসের প্যাণ্ট খুলিতে নরেন পাশের ঘরে চলিয়া গেল। নমিতা দৃষ্টিতে মিনতি জানাইয়া বলিল—'চলুন,—লক্ষ্মীটী!'

প্রভাত কোন উত্তর না দিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। নরেন কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া বলিল—'কি রে, তোরা কথা বলছিস না যে, তোদের হ'ল কি?'

'কত কথা ত হচ্ছিল এতক্ষণ, এখন আপনারা বেড়াতে চলেছেন, নতুন ক'রে আর কি কথা বলা চলে এখন!'

'সত্যিই ত'—বলিয়া নরেন একবার প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া নমিতার দিকে তাকাইয়া বলিল—'তুমি কাপড় ছাড়বে না?'

বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল ঠিক করিতে করিতে নমিতা বলিল,—'কাপড় ছাড়া হয়েছে আমার, আমি তৈরী।' প্রভাত নীরবে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নমিতা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

নরেন বড় আয়নার সামনে আসিয়া চুলে ব্রাশ দিতে দিতে বলিল—'কই গো, কত দেরী?'

'এই যাই,—এক মিনিট'—বলিয়াই জিভ কামড়াইয়া আবার তখনই বলিল—'চলো, প্রস্তুত আমি।'

ঢাকুরিয়া লেকে একটা আম্রনিকুঞ্জের পাশে নরেন গাড়ী রাখিয়াছে। নমিতাকে একা পাইবার জন্য শোফারকে সঙ্গে আনে নাই। নমিতা কবি-প্রাণ, জোছনা-রাত্রিতে লেকের ধার তার ভাল লাগিবার কথা।

শরতের অনাবিল জোছনায় লেকটা যেন সত্যই স্নান করিয়া উঠিয়াছে। নরেন আশা করিয়াছিল প্রকৃতির সহজ আনন্দের ছন্দে যোগ দিয়া নমিতা আজ তাহার মনের আহ্বানেও সাড়া দিবে,—কিন্তু দেখা গেল নমিতা গম্ভীর হইতে ক্রমে গম্ভীরতর হইয়া উঠিতেছে। নমিতার একখানা হাত নরেন নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল, নমিতা বাধা দিল না, কিন্তু নরেন বুঝিল নমিতার শরীর যেন ক্রমে কাঠ হইয়া উঠিতেছে। নরেন তবুও আশা ছাড়িল না।

সুমুখ দিয়া একখানি মোটারে এক সাহেব মেম চলিয়া গেল। সাহেব ড্রাইভ্ করিতেছে, মেমটি এক হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে,—কি কথা বলিতে গিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে, রেশমী সোণালী চুলগুলি বাতাসে উড়িয়া তার মুখে চোখে পড়িতেছে। নরেন নমিতাকে দেখাইয়া বলিল—'দেখেছ!'

নমিতা কোন উচ্ছ্বাস দেখাইল না,—নরেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া বলিল—'হুঁ।'

নমিতা কি ভাবিতেছে কে জানে, নরেন ধীরে ধীরে তার হাত মুক্ত করিয়া দিল।

গাড়ীতে বসিয়া এমন করিয়া থাকা চলে না, নরেন বলিল—'নেমে একটু বেড়াবে ?'

নমিতা গাড়ীর দরজা খুলিয়া মাটীতে দাঁড়াইল। নরেন নামিয়া নমিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কোন দিক যাবে ?'

নমিতার নিজের কোন ইচ্ছা আছে বলিয়া ত মনে হয় না, বলিল—'চল যে দিকে—।'

নরেনের ভ্রূ দুইটী বুঝি ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তার পরক্ষণেই যেন একটু শান্ত হইয়া ক্লাবের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। লেকের ধারে ধারে অসংখ্য তরুণ তরুণী ছেলে বুড়ো বসিয়া রহিয়াছে,—সকলেই উহাদের দিকে একবার তাকাইয়া দেখে। এমন সুন্দরী নারীর স্বামী সে—মালিক,—গর্ব্বে নরেনের বুক ফুলিয়া ওঠে। নমিতার এত দিনের সকল অপরাধ সে এক মুহূর্ত্তে ক্ষমা করিয়া ফেলে। সকল ভুলিয়া নমিতার কাঁধটা স্পর্শ করিয়া বলে—'দ্যাখো, লেকের ধারে আমাদের একটা বাড়ী থাকলে বেশ হয়—না ?'

নমিতার মুখে তবুও কোন উল্লাসের চিহ্ন দেখা যায় না।

'কি,—কোন উত্তর দাও না যে !'

'তোমার ভাল লাগে তুমি করো।'

'কেন তোমার ভাল লাগে না ?—বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি লেক দেখবে,—দক্ষিণের বাতাস গিয়ে তোমার সাবানমাখা চুলগুলি উড়িয়ে দেবে,—লেকের যাত্রীরা সব তোমায় দাঁড়িয়ে দেখে যাবে !'

নরেনের মুখে নমিতা এত কবিতার কথা কোনও দিন শোনে নি। মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া একটু বুঝি মায়া লাগে। কিন্তু যাহাকে সে জীবনে অন্তরের কিছুই দিতে পারিবে না, তাহার কাছ থেকে সে এত লইবে কিসের অধিকারে? নমিতা মাটীর দিকে মুখ রাখিয়া চলিতে চলিতে বলে—'না, আমার জন্য কিছু দরকার নেই।'

'কেন?'

'আমার ত থাকবার জায়গা আছেই।'

'কোথায়?'

'তুমি ত দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ আমায়।'

—'আহা বেচারা! নমিতা অমন করিয়া কথা বলে কেন, ওর কিসের দুঃখ? ও জানে না ওর জন্যেই আমার সকল পরিশ্রম, সকল অর্থ।'—ভূত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গিয়া নরেনের ইচ্ছা করিতেছিল—একটী আদরের স্পর্শ দিয়া ওর সকল ব্যথা জুড়াইয়া দেয়। সম্মুখে লোকারণ্য।

নরেন বলিল—'এস ফেরা যা'ক।'

নমিতা কোন উত্তর না দিয়া নরেনের অনুসরণ করিল।

গাড়ীতে আসিয়া নরেন অকস্মাৎ নমিতার দুটী হাত ধরিয়া বলিয়া চলিল—'অমন করে কথা বলে না, লক্ষ্মীটী,—তুমি ত জানই—'

উচ্ছ্বাসে, আবেগে নরেনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল—'তুমি ত জানই, তোমার অধিকার কি! আমার যদি কিছু সম্পদ থাকে, তার সব চাইতে বড় মালিক ত তুমি, যা'তা' কথা বলে, তুমি অমনি করে দূরে সরে যেতে চাও কেন বল ত?'

নরেনের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে নমিতার দু'খানি হাত ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল,—এখনই কি একটা ভয়ানক ঘটিবে মনে করিয়া—উহার বুকের ভিতর প্রচণ্ড আঘাতে কে যেন সতর্ক-বাণী ঘোষণা করিতেছিল।

কান পাতিয়া শুনিলে হয়ত যে কেহই তাহা শুনিতে পায়।

অথচ নরেন তাহা শুনিতে পাইল না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই শুনিল না,—সে উন্মত্তের মত বলিয়া চলিল,—'বল, আর বলবে না—কেমন ?'

নমিতার কাছ থেকে তবুও কোন উত্তর শোনা গেল না।

নরেন বাঁ হাতে নমিতার হাত ধরিয়া ডা'ন হাতে তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিল।

নমিতা সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

আদর করিতে গিয়া নরেনের ওষ্ঠ যাহা স্পর্শ করিল—সে একটী কঠিনতম রেখা, নমিতার আত্মরক্ষার একটী দৃঢ় বর্ম্ম, তাহাকে কিছুতেই ওষ্ঠ বলা চলে না। নরেন অপমানিত হইয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিল,—কিন্তু সে রাগ নিজের বুককেই জ্বালাইল। সে কিছুক্ষণ কোন কথা বলিল না। নমিতাও অতি দূরের দিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল।

প্রায় দশ-মিনিট পর স্বরে সহজ-ভাব আনিয়া নরেন ডাকিল— 'নমিতা !'

নমিতা দুর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নরেনের দিকে আনিল। 'তোমায় আজ আমি কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই,—ঠিক ঠিক উত্তর দেবে ?'

মাথা নাড়িয়া নমিতা জানাইল—'হাঁ।'

আসন্ন নূতন-বিপদের আশঙ্কায় নমিতার চোখে মুখে অসহায়ের একটী করুণ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নরেন সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিল—'আমার দিকে তাকাও'—

নরেন নমিতার চোখের দিকে চোখ রাখিয়া বলিল 'আচ্ছা,—তুমি কি আমাকে কিছুতেই ভালবাসতে পারলে না ?'

শুনিয়া নমিতা কোন উত্তর দিল না,—চোখ নীচু করিল। তারপর নমিতার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। নরেন কিছু বুঝিতে না পরিয়া শান্ত-কণ্ঠে কহিল—'আমি ত তোমায় কিছুই বলি নাই,—তবে কাঁদ কেন'—বলিয়া—নমিতার হাত ধরিয়া তুলিতে গেল।

নমিতা না উঠিয়া—হঠাৎ সীট্ হইতে নামিয়া দু'হাতে নরেনের পা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমি—'

ক্রন্দনে এর পরের কথাগুলি একেবারে অবোধ্য হইয়া উঠিল। নরেন তাহাকে একটুও স্পর্শ করিল না,—সান্ত্বনা দিল না,—অকারণ শুধু আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, কাহারও নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

দুইটী বাইশ তেইশ বছরের ছেলে সাইকেলে চড়িয়া মন্থর গতিতে আশে পাশে ঘুরিয়া শিস্ দিতে লাগিল। নরেন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল; একবার মনে হইল গায়ে হাত দিয়া তুলিয়া দেয়, কিন্তু তাহার আর দরকার হইল না, নমিতা নিজেই উঠিয়া সংযত হইয়া বসিল। ছেলে

দুইটী আরও দু'বার ঘুরিয়া—আর একবার তাকাইয়া—চলিয়া গেল। নরেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল—আজ সে একটু ভাল করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লইতে চায়।

কিন্তু জানিবারই বা কি আছে? যাহা সে ইঙ্গিতে বুঝিয়াছে, ভাষার তীব্রালোকে তাহাকে স্পষ্ট করিয়া লইয়া লাভ কি? যাহার আভাসের বেদনা তাহার সমস্ত জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে,—তাহার প্রকাশ চায় সে কোন ভরসায়? কিন্তু মানুষের মন বিচারের বাধা মানে না; বাধা পাইলে স্রোতের বেগ আরও বাড়িয়া যায়,—অথবা বেদনা পাইবারও বুঝি একটা নেশা আছে।

নরেন নমিতার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া নিজের ভাষাকে একটু মোলায়েম করিয়া লইতে চাহিল, তারপর বলিল—'তোমার অকারণ কাঁদাই বা কেন,—ক্ষমাই বা চাওয়া কেন? এ সবের মানে ত আমি কিছুই বুঝতে পারিনে।'

নমিতা মুখে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু আবার সজল হইয়া উঠিল।

নরেন কণ্ঠের স্থৈর্য্য হারাইয়া বলিল—'শুধু কাঁদলে চলে না,—উত্তর চাই।'

নমিতা তবুও কোন উত্তর দিল না।

বেদনা-বিরক্তিতে নরেনের সারামুখ ছাইয়া গেল—'জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে, তুমি জানো না এ তুমি কি করছ!'

নমিতা ছেলেমানুষের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কি মনে করিয়া হঠাৎ উঠিয়া আবার নরেনের পা ধরিয়া বলিল—'তুমি বলে দাও কি করব আমি, কি করলে তুমি সুখী হও ?'

নরেন কথার জবাব না দিয়া শুধু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে কে যেন বারবার বলিয়া চলিল—'লাভ কি ? যে আমায় মন দিলে না, তার কাছ থেকে কতকগুলি নীরস কর্ত্তব্য পেয়ে লাভ কি ?'

নমিতা নরেনের পায়ের উপর মাথা রাখিয়াই বলিল— 'বলো, নইলে কিছুতেই উঠবো না আমি আজ—'

জলে নরেনের পা দু'টী আবার সিক্ত হইয়া উঠিল। নরেন নমিতার হাত ধরিয়া উঠাইয়া পাশে বসাইয়া—তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—'আচ্ছা তুমি ঠিক করে বলো দেখি— আজ আমি একটুও রাগ করবো না—বলো—তুমি আমায় কেন— কেন বিয়ে করেছ ?'

নমিতা মাথা নীচু করিয়া পায়ের দিকে তাকাইল।

'বলো,—এ কথা বলতে হবে তোমায়—কোন রকম সঙ্কোচ না করে নির্ভয়ে বলো,—সত্যই আমি বলছি কোন ভয় নেই তোমার।'

নমিতা বলিল,—'বিয়ে ব্যাপারে আমাদের দেশের মেয়েদের কি কোন হাত আছে ?'

'থাকলে তুমি কি করতে ?'

'বিয়ে করতুম না।'

'আমাকে না হয় না করতে, কিন্তু আর কাউকে ?'

'কাউকে নয়।'

'কেন, যদি প্রভাতকে পেতে?'

নমিতা সহসা মুখ তুলিয়া নরেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া সংযত স্বরে বড় স্পষ্ট করিয়া কহিল—

'তোমার দুটী পায়ে পড়ি তুমি এমনি করে যা' তা' মুখে এনো না।'

নরেন মনে মনে খুশী হইয়া উঠিল। নমিতাও বুঝিল—বুঝিল যে নরেনের মনের ব্যথার মূল শুধু দেহেই আবদ্ধ নয়,—তার-পর মনে মনে নিজের কর্ত্তব্যও তখনই ঠিক করিয়া লইল।

নরেন ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল—

'তা'লে বিয়ে তুমি করলে কেন?'

আমি ত আগেই বলেছি—আমাদের দেশের মেয়েদের নিজের বিয়েতে কোনই হাত নেই—মামারাই আমার বিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু এ কথা ত ছোট মেয়েদের জন্যেই খাটে। তুমি ত বিয়ের সময় বেশ বড় হয়েছ, লেখা পড়া শিখেছ,—বাধা দিলেও পারতে, তা হ'লে ত আজ—'

সবটুকু না শুনিয়াই নমিতা বলিয়া উঠিল—'বাধা দিবার কোন উপায় ছিল না,—মেয়েদের তা' থাকে না।'

নরেন শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল—'কেন?'

'জানি না, আমার অন্ততঃ ছিল না,—পায়ে পড়ি আর তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করো না।'

সহসা নরেনের মুখ কঠোর হইয়া উঠিল,—একটীও কথা না বলিয়া সে চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। নমিতা ভয়

পাইয়া গেল। ইহার যে আর একটা দিক থাকিতে পারে—তাহা সে আগে একটুও ভাবে নাই। নরেনের দিকে চাহিয়া স্বরে মিনতি আনিয়া সে বলিল—'অনেক কথারই দুটো দিক থাকে,—শুধু শুধু কদর্থ করে নিও না। অপরের সংসারিক কথা প্রকাশ করা আমার রুচিতে বাধে, আর তুমি ত জানই আমার বাবা নেই,—মা নেই—ভাই নেই—'

বলিতে বলিতে নমিতার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

নরেনের ললাট হইতে দুশ্চিন্তার রেখা যেন যাদুমন্ত্রে দূর হইয়া গেল। তাহার পর কথার সূত্র ধরিয়া বলিল—'সেই জন্যই ত তোমায় আমি চেয়েছিলাম। তোমার মামাবাবুর কাছে আমি যখন যেতাম,—তোমার কথা শুনে তোমায় দেখে কেমন মায়া লাগত।'

একটু সহানুভূতির কথা শুনিয়া নমিতা কি জানি কেমন করিয়া নরেনের দিকে চাহিল।

নরেন হয়ত তাহা বুঝিতে ভুল করিল,—সে হঠাৎ নমিতার একখানা হাত প্রবল আগ্রহে চাপিয়া ধরিল। মুহূর্ত্তে নমিতার মুখ-চোখ কঠোর হইয়া উঠিল,—সে জোর করিয়া হাত খানা ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নরেন হাত ছাড়িয়া দিল।

রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল,—তাহার নিজের স্ত্রীর কাছে থেকে সে এরূপ ব্যবহার পাইবে কেন?

সহসা ক্ষিপ্তের মত নমিতার দিকে চাহিয়া সে বলিল—'কিন্তু কেন? এ সবের মানে কি—বলতে হবে তোমায়! আমার ছায়া

দেখলেই যে আৎকে ওঠো—এর কারণ কি ?—আমি কি কানা,—খোঁড়া,—কুষ্ঠ রোগী ?—আমি বোবা নই,—কালা নই,—রোগা নই। আমার যৌবন আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, মান আছে,—তবে এত ঘৃণা তোমার কিসে ?'

'ঘৃণা তোমায় আমি একটুও করি না,—তুমি আমায় মাপ করো'—বলিতে গিয়া নমিতা আবার কাঁদিয়া নরেনের পা জড়াইয়া ধরিল। নরেন পা ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, নমিতা আরও চাপিয়া ধরিল। নরেন আর একটিও কথা না বলিয়া মোটারে ষ্টার্ট দিল।

পথে পাগলের মত মোটার ছুটাইতে গিয়া নরেন বুঝিল—নমিতাকে বাড়ী রাখিয়া পথে পথে মোটার ছুটাইতে সেদিন তাহার আরও প্রয়োজন আছে।

পরদিন সকালে সাধারণ জীবন-যাত্রার একটু ব্যতিক্রম ঘটিল।

অতি প্রত্যূষে বাড়ীর চাকর রজনী আসিয়া বিভার ঘরে ঢুকিল। তার চোখমুখ একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইত কি একটা বিশেষ-তত্ত্বের সন্ধান সে বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং তাহা প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত তার স্বস্তি নাই। রজনী বিভার ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ঘরের দোর বন্ধ হইল,—এবং তাহার পর উহাদের যে কি আলোচনা হইল, তাহা সাধারণের জানিবার কোন সুযোগ নাই। প্রায় বিশ মিনিট পর লেখা আসিয়া রজনীকে ডাকিলে রজনী বাহির হইয়া গেল, এবং তার অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল বিভা ধীরে ধীরে নমিতার ঘরের দিকে যাইতেছে।

বিভা ঘরে ঢুকিতেই দেখিল—নরেন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চেয়ারে বসিয়া আছে,—নমিতা রুটীতে মাখন মাখাইয়া চায়ে চিনি দিতেছে।

দৃশ্যটী অবশ্য অপ্রত্যাশিত। বিভা এইমাত্র রজনীর কাছে যাহা শুনিল তাহাতে এমনটী সে একেবারেই আশা করে নাই। কিন্তু মুখে সহজ ভাব আনিতে বিভার মোটেই সময় লাগে না, সে মৃদু হাসিয়া বলিল—

'—এই যে—তোমরা দু'জনেই উঠেছ দেখছি!'

চা নাড়িতে নাড়িতে নমিতা বলিল—'আপনি ভেবেছিলেন অন্ততঃ আমি এখনও ঘুমিয়ে আছি—নয় কি?'—বলিয়া হাসিল।

বিভা কোন উত্তর দিবার আগেই নরেন বলিল—

'তবু ভাল, এতদিন পরে ঘরে রাঙা-বৌদির পায়ের ধূলো পড়্‌লো !'

বিভা নিজের বুকের ভিতর যেন কিসের একটা ভীষণ গর্জ্জন অনুভব করে। কিন্তু বিভা তাহাকে শাসন করিতে জানে। অতি সহজ কণ্ঠেই সে বলে—

'তুমি কি এখনই বেরুবে ?'

'হাঁ—কেন বল ত ?'

বিভা নমিতার দিকে চাহিয়া বলে—'উনি বেরিয়ে গেলে অবসর করে আমার ঘরে একবার এসো'—বলিয়া ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়া যায়।

নিজে কিছু বুঝিতে না পারিয়া নমিতা চা দিতে গিয়া নরেনের মুখের দিকে একবার তাকাইল,—কিন্তু দেখে—হঠাৎ নরেনের মুখে যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা বিভার আচরণের চেয়েও দুর্ব্বোধ্য। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা শুধু চায়ের বাটী আগাইয়া দিল,—নরেনকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

ইহার আধ ঘণ্টা পরে নরেন বাহিরে গেলে নমিতা বিভার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। বিভা তখন একখানা খাতা খুলিয়া কি যেন লিখিতেছিল ; নমিতাকে দেখিয়া খাতা তুলিয়া কলম উঠাইয়া বালিকার মত হাসিয়া বলিল—'আরে, এস, এস' ;—তারপর হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল—'উনি বুঝি এই বেরুলেন ?'

'হাঁ'

'থাকলে বুঝি একটুও ছুটী মেলে না,—নয় ?'

কথাটা নমিতার মনের উপর কেমন কাজ করে দেখিবার জন্য বিভা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে তাকায়। নমিতা কোন উত্তর করে না, কিন্তু তাহার মুখের ভাবে বিভা যাহা বোঝে তাহাই যথেষ্ট। বিভা অন্তরে একটু খুশী হইয়া উঠিল কি না ভাল বুঝা গেল না। কিছু বুঝিবার অবকাশ না দিয়াই সে নমিতাকে জিজ্ঞাসা করে—

'বড় ভয় পেয়ে গেছ—নয় ?'

'কেন ?'

'কেন জানি না তোমার মুখ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

'কৈ—না।'

'না, ভয় পাবার কিছু নেই, অনেক দিন তোমায় একেবারে কাছে পাই না, তাই ডেকেছি।'

নমিতা এ কথা বিশ্বাস করিল বলিয়া মনে হয় না।

বিভা হয়ত ডায়েরী উঠাইতেই ড্রয়ার খুলিল—

'তোমার মামাবাবু বুঝি বিলেত গিয়েছেন ?'

'হাঁ'

'তোমার মামীমা বুঝি এখানে আছেন ?'

'হাঁ'

'কে তাকে দেখাশুনা করে ?'

'তার ছোট ভাই তার কাছে থেকেই স্কটিশে পড়ে,—আর একটা চাকর আছে—পুরানো।'

সাধারণ কথাবার্ত্তায় নমিতার মন সহজ হইয়া আসিল। ইচ্ছা

করিলে সেও এখন রাঙাদির কাছে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। বিভা দেখিয়া খুশী হইল, বলিল—'তিনিই বুঝি তোমায় সব চাইতে ভালবাসতেন?'

'হাঁ'

'তুমি বুঝি তাঁর কাছে আমার কথা অনেক করে বলেছ?'

নমিতা লজ্জায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বিভা ড্রয়ার হইতে একখানা ছেড়া খাম বাহির করিয়া বলিল—'তিনি আমার কাছে একখানা চিঠি লিখেছেন।'

বিভা নিজে যাচিয়া উহার হাতে দিল না বলিয়া নমিতা আর চিঠিখানা চাহিল না।

'কি, চিঠিখানা পড়তে চাও?'

'আপনি যা ভাল বোঝেন।'

'তা'লে, না পড়াই ভালো'—বলিয়া বিভা একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল। চিঠির মাঝে কি আছে জানিতে না পারিয়া নমিতাও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বিভা একটু পরে বলিল,—'আসলে, কি জানো ভাই,—আমরা জীবনে সকলেই বড় অসহায়,—বড় দুর্ব্বল, নিজের নিজের জীবনের ভার বইবার ক্ষমতাই আমাদের নেই। তাই যখন অপর কেউ অন্য জীবনের অল্প ভার বইবারও অনুরোধ জানায়, তখন আমাদের বিপদের সীমা থাকে না। যে হাসিমুখে সে ভার নিতে চায়—সে হয় মিছে কথা বলে,—না হয় নিজের জীবন থেকে অনেক কিছু কেটে ছেঁটে ফেলে—কেমন সত্যি কি না?'

নমিতা কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল

বিভা মৃদু হাসিয়া বলিল—'বড়ই হেঁয়ালি করে তুলেছি—নয় ?'

নমিতা বলিল—'কি জানি, আমি ভালো বুঝতে পারছি না ?'

বিভা হাসিয়া কাছে আসিয়া নমিতার পিঠে হাত দিয়া বলিল—'থাক্, অত আর তোমায় বুঝতে হবে না।'

মোট কথা তোমার মামীমা চান—আমি তোমায় একটু দেখা-শুনা করি—আপন বড় বোনের মত।'

নমিতা খুশী হইয়া বলিল—'আপনি সত্যই ত তাই।'

'মামীমার কাছে যা' তা' গল্প করে ঐ ত মুস্কিলে ফেলেছ আমায়।'

'মুস্কিল কি ?'

মুস্কিল হচ্ছে এই যে আমার সত্যিকার পরিচয় তুমি পাওনি। আমি বড় কুঁড়ে,—বড় দুর্ব্বল, আর সবার উপর আমি বড়ই স্বার্থপর। এখন এতগুলি গুণ নিয়ে আমি অপরের কথা ভাবি কখন ?'

নমিতা ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল—'বেশ ত! ভাবার দরকার কি আপনার ?'

অভিমানের সুরটুকু বিভার অজানা রহিল না। সে কাছে আসিয়া নমিতার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—

'কিন্তু বোনের সুখদুঃখের ভার নিতে গেলে তার মনের সকল কথা দিদির জানা ত চাই!'

নমিতার চোখের কোণগুলি যেন হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল।

বিভা নমিতার চোখ দুটী আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল—'বোন যদি কোথাও ভুল করে, অন্যায় করে,—দিদি কিন্তু তাকে বকে থাকে,—তাতে তার দোষ দিতে হয় না।'

'সত্যিই ত!'

'আর তাতে কিন্তু দিদিকে কম ভালবাসতে হয় না!'

নমিতা এবার সত্যই হাসিয়া ফেলিল—

'না, হয় না।'

এ বাড়ীতে শুধু একটী লোকের কাছে বুঝি সে সত্যই খানিকটা ভালবাসা পায়।

বিভা এবার গম্ভীর হইয়া বলিল—'আজ আমি দিদি হ'য়েই তোমায় কয়েকটী কথা বলব। এ কথার উত্তর আমি চাই না,—নিজের মনে কথাগুলি ভেবে কাজ করলেই আমি খুশী হ'ব।'

নমিতা বিস্মিত হইয়া বিভার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিভা বলিয়া চলিল—

হিন্দুঘরের মেয়েদের স্বাধীনতা নেই মানি,—কিন্তু ব্যক্তিত্ব থাকা উচিত। ব্যক্তিত্ব বলে কতকগুলি অনর্থক গোয়ার্ত্তমীকে প্রশ্রয় দিতে আমি কাউকে বলিনা। তুমি এসেছ এ বাড়ীর বউ হ'য়ে,—বউয়ের প্রাপ্যগুলি গ্রহণ করতে যখন তুমি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করনি তখন তার দেয়গুলি দিতেও তোমার কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়। যে নিজে কিছু দিতে পারেনা,—সে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করে কোন অধিকারে? বাঙালী মেয়েদের জীবনের অনেক ব্যাপারেই নিজেদের কিছুমাত্র হাত নেই, সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না,—আর তাই বলেই পরের ঘরে এসে শুধু খেয়ালের বশে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাও তার চলে না।'

বিভার কথা শুনিয়া নমিতার মুখ ভয়ে বেদনায় পাংশু হইয়া উঠিল। বিভা তাহা দেখিয়াও দেখিল না, নিজে মরিয়া হইয়া—

সে আজ যে অস্ত্রোপচার সুরু করিয়াছে,—আজ অর্দ্ধপথে তাহাতে ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। বিভা বলিল—'তাই বলে পথ যে নেই এ কথাও বলা চলে না। নিজেকে বাঁচানো যাদের জীবন মরণ পণ হয়ে উঠেছে, ঘরের মায়া ছাড়তে হয়েছে তা'দের। এ দেশে মীরাবাইয়ের মত মেয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু ঘরের আশ্রয়ে থেকে নিজেকে পর করে রাখবে—এ ত চলবে না, বোন।'

নমিতা নিতান্ত নিরুপায়ের মতই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলিল—'তা' হ'লে কোন পথে চলবো আমি,—আপনি দিদির মতই আমায় সে কথা বলে দিন।'

বিভা নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার কাছে আসিয়া বসিল; তারপর তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—'এতো আর কা'রও বলবার কথা নয় বোন, এখানে নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিতে হয়। কারো উপর নির্ভর না করে নিজের পথে চলবার মত সম্বল যার আছে—তাঁর ত কারো দিকেই চাইতে হয় না,—কিন্তু যাকে জীবনের পথে প্রতিপদেই অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, তাকে অপরের জন্য নিজেকে বলি না দিয়ে উপায় কি?'

—'অর্থাৎ আমাকেও তাই ক'রতে হবে—এই বলতে চান আপনি?'

'অন্ততঃ মিথ্যা করেও,—নইলে একটী সংসার যে একেবারে ছারেখারে যেতে বসেছে।'

নমিতার চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে অকারণ নিজের আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—'তার ত কোন দরকার নেই,

দিদি,—উনি বড়লোক,—আর একটা বিয়ে করলেই ত সহজেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

'সেটা কি এতই সোজা? তুমি? তোমার নিজের অবস্থাটা কি হয়, একবার ভেবে দেখেছ?'

অতি কষ্টে অশ্রুরুদ্ধ করিয়া নমিতা বলিল—

'এত বড় পৃথিবীতে কারো থাকবার জায়গার অভাব হয় না দিদি,—আমারও হবে না,—তবুও ওদের সংসারে শান্তি ফিরে আসুক। এ আগুনে নিজেও আর জ্বলতে চাই না,—ওদের ও জ্বালাতে চাই না আমি।'

বিভা একবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—

'তা'তে শান্তি হবে না, দিদি,—ইচ্ছা করলে শান্তি এক তুমিই দিতে পারতে,—কিন্তু সে কি আর কিছুতেই হয় না নমিতা?'

নমিতা এইবার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইল—

'না দিদি,—নিজের কাছে অত বড় মিছে কথা আমি বলতে পারব না,—না,—কিছুতেই না—' —বলিয়া টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিভা তাহার বিছানার উপর শুধু অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া একটুও বুঝা গেল না—আজ সে নমিতার কাছে কি পাইল—বিস্ময়, বেদনা না হর্ষ?

প্রভাতের বাল্য-বন্ধু কমল জৌনপুরে মাষ্টারী করিত। প্রভাত হঠাৎ একদিন রাত্রি বারোটায় বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তাহার কাছে চিঠি লিখিতে বসিল। প্রভাত লিখিল—

ভাই কমল,

এতদিন পরে, বন্ধুর কাছ থেকে এমন একখানা চিঠি পেয়ে চমকে উঠো না যেন! তোমায় আরো বলে রাখছি—রাত এখন বারোটা। ঘুম আমার কিছুতেই আসছে না। আমার মনের রুদ্ধ কক্ষে যে ভাবভ্রূণ আজ আত্ম-প্রকাশের জন্য অধীর হয়ে উঠেছে—তা'কে জগতের আলো না দেখালে আমার কিছুতেই আজ মুক্তি নেই। হোষ্টেলে থাকতে কতদিন এমনি করে দুপুর-রাতে তোমার ঘুম ভেঙ্গেছি—মনে আছে ?

অবাস্তব কল্পনা নিয়ে যে সব ছবি এঁকেছি, কবিতা লিখেছি—তার ধৈর্য্যশীল দ্রষ্টা ও শ্রোতা ছিলে তুমি। তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টি আমার দোষ ত্রুটী মার্জ্জনা করেনি,—গুণপনার অনাদর করেনি, তাই আজ রাত দুপুরে বসে তোমার কাছে নিজের মনের গোপন কথাটী লিখতে বসেছি। বন্ধু,—এবার আব এ অবাস্তব কল্পনা নয়,—এ আমার নিজের জীবনের অনুভূত সত্য,—কঠিন রহস্যময়—অথচ অতি,—অতীব মধুর সত্য।

বন্ধু, তোমরা জান যখন কেউ পর্ব্বত-শৃঙ্গ থেকে সোজাসোজি

মাটীর বুকে যাত্রা করে,—তার সেই কয়েক মুহূর্ত্তের যাত্রা-পথটুকু তাকে ভয়ে বেদনায় মূর্চ্ছিত করে দেয়। এই সুন্দরী পৃথিবীর কাছ থেকে চিরবিদায়ের করুণ কথাটী তার শেষ বারের মত শুনে যাবারও সুযোগ মেলে না। কিন্তু ভেবে দেখো—কারো উর্দ্ধ-যাত্রার বেলায়ও এ কথাটা বেসুরো লাগবে না।

মনে কর,—রকেটে চড়ে কেউ মঙ্গলগ্রহে যাত্রা সুরু করেছে। গতির ক্ষিপ্রতা Geometrical progressionএ বেড়ে চলেছে, কল্পলোকের স্বপ্নেভরা রঙীন নেশা—তখন মাটীর বুকের স্নিগ্ধ শ্যামল ভালবাসাকে একেবারে তুচ্ছ করে দেয়। হয়ত সেখানে আর ফিরে আসবে না—সে কথা সে জানে, কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? তার চিরকালের স্বপ্নলোকের যাত্রা ত সফল হ'তেও পারে,—হয়ত সেই নূতনের আনন্দই তাকে মোহাবিষ্ট করে তোলে। কিন্তু আসল কথা—গতির আবেগে তখন তার জ্ঞানই থাকেনা, আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ থাকেনা—নয় কি?

উত্থান-পতনের কেবল আরম্ভটাই আমাদের করায়ত্ব,—বাকীটা চলে এক অজ্ঞাত অজ্ঞেয় শক্তির খেয়ালে।

এখন বোধহয় বুঝতে পারছ—যে বলতে চাই আমার মন যে পথে ক্ষিপ্রগতিতে চলেছে তাকে আমি পতন বলতে কিছুতেই পারিনা,—তাকে আমি বলব উর্দ্ধ-যাত্রা,—সুরলোক বা দিব্য-লোক যাত্রা। পতনের শেষ প্রাপ্তি যে কি—তা জানবার সুযোগ মানুষ অবশ্য আগে পায় না,—কল্পনা করে, বোঝে না—কিন্তু তবু কল্পনা ত করে—কিন্তু উপরের রাজ্য যে মানুষের আরও

অপরিজ্ঞেয় ; যাত্রা সুরু হয়—অথচ শেষ মেলে না, আছে জানে—অথচ স্বরূপ পায় না,—অথচ চলারও শেষ হয় না। মানুষের জীবনে এমন ঘটতেও পারে,—অন্ততঃ আমার জীবনে ত ঘটেছে—আমি ভালবেসেছি—

আর আমার সে মানসী এখন এই বাড়ীরই আর এক ঘরে তার স্বামীর সাথে এক-কক্ষ-শায়িনী। স্বামী!—তুমি হয়ত চমকে উঠবে। কিন্তু কেন—তাতে দোষ কি—নিছক মনের ভালবাসাতে দোষ কি ? দাঁন্তে বিয়েত্রিচ্‌কে বাসতেন, জয়দেব লছমীকে, চণ্ডিদাস রামীকে। চল্‌তি কথায় যাকে প্রেম বলে তাতে মাটীর গন্ধ থাকে,—মনের গোপনে দেহভোগের তৃষ্ণা লুকানো থাকে, কিন্তু আমি ত নিজের মনে সে সব খুঁজে পাই না—তাই আমার মনে গ্লানি নেই, শঙ্কা নেই, তাই তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করে আমি গৌরব অনুভব করছি—যে আমি একজনকে ভালবেসেছি। আমার হৃদয়-বীণায় যে সুর বেজে উঠেছে তা আমি অন্ততঃ একজনকেও শুনাতে চাই।

আর তা' ছাড়া শুদ্ধ মনের আনন্দে পাপ কোথা ?—এ যদি পাপ হয় তা হ'লে কবিতায় পাপ, সঙ্গীতে পাপ,—দেবতার আরাধনায় পাপ।

তুমি বলবে জগতের সকল আকর্ষণের মূলেই রয়েছে পাপ—তবে একটু মোলায়েম ভাষায়—অর্থাৎ যৌন-বোধ। জগতের বৈজ্ঞানিকেরা না কি এই কথাই বলেন। তা' বলুন—তাই বলে শিল্পীর সৌন্দর্য্য-বোধ আর লম্পটের ইন্দ্রিয়াসক্তিকে আমি এক পর্য্যা-ভুক্ত করতে কিছুতেই পারব না। পুরীর সমুদ্রে বা টাইগার

হিলে স্বর্য্যোদয় দেখে অথবা গুণীর মুখে দরবারী কানাড়ার আলাপ শুনে তোমার মনে যে ভাবের উদয় হবে তার সঙ্গে লম্পটের ইন্দ্রিয়াসক্তির মূলতঃ সাদৃশ্য আছে এ কথায় আমাদের মন কিছুতেই সায় দেয় না।

কিন্তু আসল মুস্কিল সেখানে নয়। মুস্কিল হচ্ছে—সে আমার আত্মীয়া, আমার পিসতুতো ভাই নরেনদার স্ত্রী, অবশ্য প্রথম পক্ষের নয়—দ্বিতীয় পক্ষ। সেইটাই হয়েছে বেশী মুস্কিল। নরেনদা তার চিত্ত জয় করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না,—তাই সে যদি অনায়াসে তার সমস্ত মনটা আমায় দিয়ে ফেলে,—তা'তে অস্বাভাবিক কিছু নাও হ'তে পারে কিন্তু আমার হবে দ্বিধা। আমার পূজা জানাতে গেলে মনে হবে লোভ দেখিয়ে ওর মন কেড়ে নিলাম,—জীবনের পথে স্বচ্ছন্দে সংসারকে মেনে নিতে বুঝি আমিই ওর মনকে স্থযোগ দিলাম না।

তাই ভয়ে ভয়ে চাই,—ভয়ে ভয়ে কথা বলি।

এই ভয়ের বাধাই আমার ভালবাসাকে দুর্ব্বার করে তুলেছে। তাই বাইরে তার আজ আরও বাঁধনের প্রয়োজন। কিন্তু সে বাঁধন ত ছলনা, আত্মপ্রবঞ্চনা। এ মিথ্যার অভিনয় আর কত দিন চলবে? একদিন হয়ত এর খোলস খসে যাবে। সেদিনকার—সে সত্যমূর্ত্তিকে কল্পনা করে আজ আনন্দের চাইতে ভয়ই লাগে বেশী। তুমি ত জানো—বাড়ীতে আমার মা আছেন, ইন্দু আছে।

যাকে অবলম্বন না করে জগতে আসা চলে না,—তাঁর গুরুভার আমার মন স্বচ্ছন্দে মেনে নেয়,—কিন্তু যার কথা ভাববার আমার

কোন দিনই প্রয়োজন ছিল না, সেও যে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তুমি ত জানো—প্রাচীর ভাঙ্গতে না পেরে অনেক সময় আমরা নিজের বুকই ভাঙ্গি।

এই ত গেল এক দিকের কথা। এ ছাড়া আর একটা দিকও আছে। নমিতার (আমার মানসী) স্বামী আমার আত্মীয়, আশ্রয়দাতা। যে আমায় ঘর দিয়েছে, তার ঘর ভাঙ্গতে আমি কিছুতেই পারি না।

এক একবার মনে হয়—এ বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই, কিন্তু পারি না,—কেন জানি না, তবে মনে হয় নমিতা বড় অসহায়া, তাকে এমনি করে ফেলে যাওয়া চলে না,—ও যে প্রাণ খুলে দুটী কথা বলবে এমন লোকও এ বাড়ীতে আর নেই। তুমি বলবে এ তোমার দুর্ব্বলতা। আমি তা অস্বীকার করি না,—আমি সত্যিই ওকে না দেখে থাকতে পারিনা।

প্রভাতে ওকে একবার না দেখলে আমি দিনের কাজে শক্তি পাই না। মেয়ে মহলে হয়ত আমাদের নিয়ে অনেক কথা ওঠে, —হয়ত কেন—ওঠেই। কিন্তু আমার তাতে রাগও হয় না, দুঃখও হয় না,—শুধু হাসি পায়,—ভাবি মনের কত জটিল তত্ত্ব এত সহজেই লোকে বুঝে ফেলে কি করে?

শুধু নরেনদা একটীও কথা বলে না,—আমাদের দেখাশুনা কম পড়লে বরং আরও ক্ষুন্ন হয়। সন্দেহের একটী রেখাও তার মনে ছায়া পাত করে না,—অথচ নমিতার কাছ থেকে তার ন্যায্য পাওনাগুলি সে এখনও বুঝে নিতে পেরেছে বলেও ত মনে হয় না। এই বা কি করে হয়?

এ বাড়ীর আর এক রহস্য—আমার দিদি,—রাঙাবৌদিকে বোধ হয় তোমার মনে আছে,—তাকেই আমি আজকাল দিদি বলে ডাকি। তার কাছে কিছু না বললেও তিনি আমায় অনেকটা বুঝে নিয়েছেন,—তাতে করে তিনি আমায় যে যুক্তি দিতে চা'ন—সে হুবহু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সঙ্গে মিলে যায়—অর্থাৎ তিনি বলতে চান—

'যঃ পলায়তি স জীবতি—'

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে—নইলে মরণের সম্ভাবনা যে কোথায়—তাই যে এখনও ভালো বুঝতে পারছি না।

সব কথা খোলসা করে বললে—ওর কাছ থেকেই হয়ত অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, কিন্তু ওর নিজের জীবনই এত দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে—যে তাতে আর অন্য কারো লঘু ভার তুলে দিলেও তার'পর সত্যিই অত্যাচার করা হয়। নিজেকে তিলে তিলে বলি দিয়ে দিদি যে কিসের পূজাই করে চলেছে—তা' আর ভেবে পাই না।

ও দিন রাত সাজগোজ করে, হাসি দিয়ে, কাজ দিয়ে যেমন করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়, তা দেখলে সত্যিই তোমার কান্না পাবে।

ওর কথা ত তুমি জানই।

এবার দেখা হ'লে তোমায়—আরও হয়ত বলতে পারবো। কিন্তু আমার মনের গতি কোন পথে চলেছে—তাও কি বলতে পারো না?

আমার মনটা তোমার মত করে আর কেউই জানে না—তাই

তোমার চিঠির জন্য সত্যিই আমার অধীর প্রতীক্ষায় দিন কাটবে।

মানুষ এত শক্তিহীন যে নিজের মনটাই সে নিঃসংশয়ে জানে না,—নিজেকেই সে ভালো করে প্রকাশ করতে পারে না, তাই নিজের কথা বলতে গিয়ে—নিজের অক্ষমতাই বার বার আমায় লজ্জা দিচ্ছে।

আমার অস্পষ্ট আলেখ্য—তুমি নিজের তুলির টানে স্পষ্ট করে দেখো। ভালবাসা নিও, ইতি

তোমার—

প্রভাত।

পত্র শেষ করিয়া প্রভাত একবার বাহিরে আসিল। দোতালায় নমিতার ঘরের মৃদু নীল আলো পরদার ভিতর দিয়াও দেখা যায়। দূরে একটী কুকুর ঘেঁউ ঘেঁউ করিয়া ডাকিয়া চলিয়াছে। কমল চিঠিখানা পাইয়া কি ভাবিবে কে জানে। হেনার পাতাগুলি জ্যোৎস্নালোকে রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। নমিতার ঘরের পর্দ্দার পাশে কে যেন শাদা কাপড় টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে।

প্রভাত আর একটু স্পষ্ট করিয়া তাকাইল—কাপড় খানা জানালা হইতে ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া গেল।

একবার মনে হইল উপরে গিয়া দিদির ঘরটী একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আসে,—কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি ভাবিয়া নিজের ঘরে আসিয়া দোর বন্ধ করিল।

নরেন আফিসের জামা কাপড় ছাড়িয়া বিশ্রাম করিতে বসিবে এমন সময় রজনী আসিয়া সংবাদ দিল—নরেনের হাত মুখ ধোয়া হইলে বড়বৌ নীচে তাহাকে ডাকিয়াছেন।

এ অপ্রত্যাশিত আহ্বানে নরেন বিস্মিত হইল,—আজ অসময়ে হঠাৎ এ আহ্বান কেন? এরূপ ত হয় না। হাঁ, হইত বটে দশবছর আগে—তাহার বয়স ছিল যখন ২৪।২৫—লীলা যখন এ বাড়ীতে প্রথম আসিয়াছে। নানা কারণে তিনি ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং লীলাকে লইয়া নানা রহস্যে তিনি নরেনকে পাগল করিয়া তুলিতেন।

দশ বৎসর আগেকার স্মৃতি মুহূর্ত্ত-কালের জন্য তাহাকে বিমনা করিয়া তুলিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে সাবান ও তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

নমিতা আজকাল ইলেক্‌ট্রিক্ কেট্‌লীতে জল বসাইয়া নিজেই নরেনের জন্য চা তৈয়ারী করে। তাহা লইয়াও কত কথা হয়।

নরেন স্নানঘর হইতে আসিলে নমিতা বলিল—'জল চাপাব?'

'না।'

'দিদির কাছ থেকে এসে চা খাবে?'

গেঞ্জিটা গায়ে দিতে দিতে নরেন বলিল—'কি জানি হয়ত তোমার আর কষ্ট করে জল চাপাতে হবে না,—বৌদি বোধ হয় কোনো বন্দোবস্ত করেছেন।'

নরেনের অনুমান মিথ্যা নয়। নীচে আসিয়া দেখিল দশ বছর আগে তাহারা দু'ভাই যেখানে পাশাপাশি খাইতে বসিত সেখানে দু'খানা আসন পাতা হইয়াছে। আসন দু'খানাই বৌদির নিজের হাতে বোনা। তাহার পাশে জলের গেলাস দুটী মাজিয়া সোনার মত করিয়া তোলা হইয়াছে। বড়বৌকে দেখিয়া মনে হয় যেন তাহার প্রতীক্ষায়ই বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। নরেন দেখিয়া—হাসিয়া বলিল—'তারপর হঠাৎ!'

বড়বৌ বিদ্রূপের হাসিতে ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন—'কেন, বৌদির হাতের খাবার আজকাল তেতো হয়ে গেছে নাকি?'

'তেতো কি মিঠে হ'ল তা জানবার সুযোগ কই?'

সিঁড়ীতে প্রকাশ বাবুর পায়ের শব্দ শোনা গেল,—লেখা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে।

'বাবা, মা তোমাদের জন্যে আজ নিজে খাবার করছে।'

সিঁড়ীর শেষ ধাপ হইতে বারান্দায় পা ফেলিয়া প্রকাশ বাবু বলিলেন—'হঠাৎ!'

বড়বৌ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'দুই ভাইয়েরই এক কথা! কেন আমি কি তোমাদের কোনদিন খাবার করে দিই নি—না কি?'

নরেন হাসিয়া বলিল—'কিন্তু সে ত আজকার কথা নয় বৌদি,—পাঁচ সাত বছরের মাঝে আপনার হাতের খাবার খেয়েছি বলে ত মনে হয় না। কি চমৎকার হিংএর কচুরী করতেন আপনি, আজকে আছে ত?'

'আছে'—বলিয়া বড়বৌ রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

আসনে বসিয়া প্রকাশ বাবু তাহার ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন —'এবারকার শিপমেণ্ট কবে তোমাদের ?'

'সোমবার।'

'শুনছি রাখালবাবু নাকি কাজে কি সব গোলমাল করেছে— ওকে ছাড়িয়ে দিলে ত পারো। টাকা পয়সার ব্যাপারে অমন 'লিকেজ' থাকা ত ভালো নয় !'

নরেন কি ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—'দেখি।'

'আমাদের প্রভাতটা কি করে বেড়ায়,—চিরদিন মাষ্টারী আর টিউসনী করে দিন যাবে নাকি,—ওকে কিছু কাজকর্ম্ম শিখিয়ে নিলেও ত পারো।'

বড়বৌ দু'পাতে লুচী আর বেগুন দিয়া দাঁড়াইলেন—'কি বলছ তোমরা ?'

প্রকাশবাবু তাহার কথার উত্তর না দিয়া নরেনকে উদ্দেশ করিয়াই বলিলেন—'হাঁ,—ও মাষ্টারী ছেড়ে দিক।'

বড়বৌ বলিলেন—'কে ?'

'কে আর, এই প্রভাত, মাষ্টারী আর তোমাদের বাড়ীতে কে করে গো ?'

তারপর বেগুনে একটী কামড় দিয়া বলিলেন—'আর ওকে একবার বাড়ী যেতে বলো ত,—মামীমা চিঠি লিখেছেন— ও নাকি অনেক দিন বাড়ী যায় না,—চিঠি পত্রও লেখে না।'

বড় বৌ ঠোঁটের এক কোনে বিষের ঝিলিক হানিয়া বলিলেন 'হাঁ, ও মাষ্টারীও ছেড়েছে—বাড়ীও গেছে !'

দাদার সামনে বৌদি আরও কি বলিয়া বসেন—ভাবিয়া নরেন প্রায় ঘামিয়া উঠিল।

প্রকাশবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন?'

বড়বৌ স্পষ্ট জবাব না দিয়া পিছন ফিরিয়া বলিলেন—'এমনি!' তারপর রান্নাঘরের দুয়ারে পা দিয়া বলিলেন—'অত কাব্যি করতে গেলে কি বাড়ীর কথাই মনে থাকে—না ব্যবসায়ই করা যায়?'

বড়বৌ কচুরী লইয়া আসিলে নরেন কথার মোড় ঘুরাইতে বলিল—'বৌদির কচুরী দেখলে এখনও জিভে জল আসতে চায়।'

বড়বৌয়ের মুখ তবুও সহজ হইয়া উঠিল না।

নরেন বলিল—'বৌদি আর এ বিদ্যাটা কাউকে শিখালেন না।'

বড়বৌ কচুরী দিতে দিতেই বলিলেন—'কে আর শিখবে বল? আজকালকার মেয়েরা আর এতে আনন্দ পায় না। খাবার ত দোকানেই মেলে, তা'র চাইতে একটু সেজেগুজে গান গেয়ে, সিনেমা দেখে, পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে• বেড়িয়ে ঢের বেশী আনন্দ পায়।'

প্রকাশবাবু বড়বৌয়ের অতিশয়োক্তিতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন '—তুমি এখন থামো!'

নরেন ভীত হইয়া উঠিল।

বড়বৌ বলিলেন—'থামবো কেন শুনি; উচিত বললে সকলেরই রাগ হয়। এই আমাদের ছোটবৌয়ের কথাই ধরো,—দিনরাত প্রভাতের সঙ্গে ফিস্‌ফাস কথা হচ্ছে,—নয়ত নভেল—নয়ত গান। কেন বাপু দু'চার পদ রেঁধে স্বামীকে খাওয়াতে পারো না? এখনও ত ছেলেপিলে হয়নি, সময়ের অভাব কিসের? ঠাকুর পো বলে

—বৌদি পাঁচ ছয় বছর তোমার হাতের খাবার খাই না,—
—আমার পাঁচটীতে পাঁচদিকে টানছে,—ফুরসৎ কোথা? কিন্তু
ওর ত এ সব জঞ্জাল নাই,—পাঁচ রকম খাবার শিখিয়ে দিতেও ত
পারি—কিন্তু শিখবে কে?'

নরেন একটুও কথা না কহিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।
প্রকাশবাবু শুধু বড়বৌয়ের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া
রহিলেন।

'কিছু হয়ত না বলাই ভাল! কিন্তু আমাদেরও যে বাধে।
ঠাকুরপোকে এবাড়ীতে এসে আশিসের মত দেখেছি।'—বড়বৌয়ের
চোখ এবার জল-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি তাহাতে
আঁচল বুলাইয়া বলিয়া চলিলেন—

'যাকে নিজের হাতে মানুষ করতে হয়েছে তার ভালমন্দতে
দুটী তেতো কথা বলে তেতো কথা শুনতে আমি একটুও ভয়
করিনে।'

অজানা আশঙ্কায় নরেনের ভিতরটা একেবারে কাঠ হইয়া
উঠিল। সে অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া বড়বৌকে বলিল—
'বৌদি, আপনার যা বলবার আছে, শুধু আমাকেই বলবেন—
তা'হ'লে আমাদের সকলের মঙ্গল হবে।'

বড়বৌ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তার প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসকে সংযত
করিয়া লইলেন।

ইহার পর আহারে আর কাহারও তেমন আগ্রহ রহিল না।
প্রকাশবাবু তাড়াতাড়ি জলযোগ শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।
লেখা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তখনও কচুরীতে কামড় বসাইতেছিল,—

তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আমার সঙ্গে উপরে যাবি, আয়।'

দাদা উপরে গেলে নরেন আসনে বসিয়াই বড়বৌয়ের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

তখন ঝোকের মাথায় বলিলে হয়ত অনেক কথাই বলা যাইত, কিন্তু এখন বড়বৌয়ের মুখে আর বেশী কথা যোগাইল না, তিনি শুধু বলিলেন—

'বেশী কিছু আমি আর বলতে চাই না, ঠাকুর পো,—কাজের ব্যবস্থা করে তুমি কিছুদিন নতুন বৌকে নিয়ে কোথায়ও ঘুরে এসো,—বেশী দেরী করো না,—নইলে সংসারে এমন আগুন জ্বলবে যে কিছুতেই তা নেভানো যাবে না। তোমাদের মা বেঁচে থাকলে —এ উপদেশ আজ আমাকে দিতে হ'ত না।'

বলিতে গিয়া বড়বৌয়ের চোখে আবার জল দেখা গেল; তাহা রোধ করিতে তিনি চোখে আঁচল দিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন। নরেন কিছুক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উপরে রওনা হইল।

নরেন যখন ঘরে আসিল—

তখন নমিতা অর্গানে বসিয়া বাজাইতেছে, আর তারই একপাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া প্রভাত অতুল-প্রসাদের—'কাকলী' খুলিয়া 'জল বলে চল, মোর সাথে চল'—গানটী গুনগুন করিয়া গাহিয়া চলিয়াছে।

নরেন আসিতেই গান বাজনা থামিয়া গেল। নমিতা অর্গানের টুল হইতে উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল—'জল চাপাব?'

নরেনের মনে হইল এমন বিপুল-আগ্রহ বুঝি নমিতার মাঝে সে কোনদিনই দেখে নাই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার দিকে তাকাইয়া সে উত্তর করিল—'না।'

'কেন,—চা খেয়েছ না কি ?'

'না।'

'তবে ?'

'এখন আর চা খাবার ইচ্ছা নাই'।

প্রভাত ও নমিতা কেহই কিছু বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করিল। নরেনের দৃষ্টিতে তাহাও এড়াইল না।

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। তারপর প্রভাত বলিল 'ছোটদা —এ গানটা শুনেছেন ?'

মুখ না ফিরাইয়াই গুরু-গম্ভীর স্বরে নরেন বলিল—'কোনটা ?'

'এই অতুলপ্রসাদের—গান—'জল বলে চল'—আজ এই মাত্র এই গানটা আমার এক ছাত্রীকে শিখিয়ে এলাম কিনা,—বৌদি বল্‌ছিলেন ঐ গানটা গাইতে।'

'হুঁ'

তারপর আরও কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলিল না।

'তুমি বাড়ী যাও-না কত দিন ?'

'তা' অনেকদিন হ'বে'—প্রভাত বলিল।

'কেন ?'

'এই যাই যাই করে আর যাওয়া হয় না।'

'হুঁ'

আরও দু'মিনিট কাটিয়া গেল। প্রভাত 'কাকলী'র পাতার উপর পাতা উল্টাইয়া চলিল।

'বাড়ীতে চিঠি লেখো না কেন?'

প্রভাত বলিল—'চিঠি লিখিত!'

'মামীমা দাদার কাছে লিখেছেন—অনেকদিন তোমার সংবাদ পান না। সামনের শনিবারে একবার বাড়ী গিয়ে তাদের দেখে আসবে, আর চিঠি পত্র লিখতে এত দেরী করো না।'

প্রভাত অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিল। নরেনের মুখে 'তুমি'—ডাক প্রভাত বহুদিন শোনে নাই,—আর তাহাকে এত গম্ভীরও কোন দিন দেখে নাই।

নমিতা অর্গানের টুলে বসিয়া স্বরলিপির পাতা উল্টাইয়া চলিয়াছে, একবার শেষ হইলে আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করিতেছে।

নরেন রাইটিং প্যাড বাহির করিয়া পাঁচ মিনিট ধরিয়া একখানা চিঠি লিখিল,—তারপর সেখানা খামে পুরিয়া উপরে লিখিল—রাখাল চন্দ্র বোস্,—হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। চিঠিখানা প্রভাতের হাতে দিয়া নরেন বলিল—'চিঠিখানা এখনই রাখালবাবুকে পৌছে দাও,—আর বলবে কা'ল খুব ভোরেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।'

চিঠিখানা হাতে পাইয়া প্রভাত একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল—'তা হ'লে ব্যবসা সংক্রান্তই, আর কিছু নয়।'

প্রভাত চলিয়া গেলে নমিতা তাকাইয়া দেখিল নরেন তাহারই

দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। সে দৃষ্টিতে প্রসন্নতার লেশমাত্র ছিল না,—তাই নমিতা দৃষ্টি নত করিয়া কহিল—'চা করব ?'

'বড় যে দরদ্ দেখতে পাচ্ছি।'

ব্যঙ্গ করিতে গিয়া নরেনের মুখ চোখ দারুণ কদর্য্যতায় ভরিয়া গেল।

নমিতা একবার সে দিকে তাকাইয়া স্থিরকণ্ঠে কহিল—

'দরদের এমন কি দেখলে ?'

'বলেছি ত চা খাবনা,—তবুও আদর দেখানো হচ্ছে কেন ?'

নমিতা এ কথার কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না,—অর্গানের রীডের দিকে চোখ রাখিয়া হয়ত আরও তিক্ততর কিছু শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

'মনে করেছ বাইরে এমন আধিক্য দেখিয়ে—চোখে ধূলো দেবে ? তোমরা ছাড়া সকলি এমনি হাবা ? সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিচ্ছি আমি। প্রভাতকে এ বাড়ী থেকে তাড়াচ্ছি আমি।'

নরেনের কথার মাঝে যে কুৎসিৎ ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার কথা ভাবিয়া নমিতা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নরেনের পায়ে হাত রাখিয়া বলিল—'তোমার পায়ে পড়ি, রাগের মাথায় তুমি যা' তা বলো না,—প্রভাতকে শুধু শুধু বাড়ী থেকে তাড়িও না; তা'তে ফল একটুও ভাল হবে না,—তার একটুও দোষ নাই। তোমার যদি সত্যিই সন্দেহ হয়, তবে বরং আমাকেই আর কোথাও পাঠিয়ে দাও।'

নমিতার কথা শুনিয়া নরেন প্রথমে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া—বিকট স্বরে বলিল—

'এতটা অধঃপতন হয়েছে তোমার ?'

নমিতা সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর স্থিরদৃষ্টিতে নরেনের দিকে তাকাইয়া বলিল—'অধঃপতন আমার নয়,—অধঃপতন হয়েছে তোমার,—যে শ্রদ্ধাটুকু তোমায় এতদিন করে এসেছি,—তা'ও তুমি আজ নিজে হাতে কেড়ে নিলে,—এখন কি সম্বল নিয়ে এখানে থাকবো আমি !'

মুহূর্ত্তের জন্য নরেন আত্মসংযম হারাইল। চেয়ার থেকে লাফাইয়া উঠিয়া নমিতার গলা ধরিয়া ধাক্কা মারিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—'না থাকো যাও,—যেখানে খুশী চলে যাও,—ঘর থেকে বেরিয়ে যাও,—দোষ ত আমারই, ঘুটেকুড়ুনীর মেয়েকে রাজরাণী করতে চেয়েছি যে !'

গোলমালে বিভা দৌড়াইয়া আসিয়া নমিতার হাত ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া লইল। নরেন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রথমে চেয়ারে আসিয়া বলিল, তারপর উঠিয়া দরজা বন্ধ করিল।

সেদিন রাত্রে নমিতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিভার পাশেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিভার সে রাত্রি কি করিয়া কাটিয়াছিল,—একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া সে সংবাদ আর কাহারও জানা নাই।

ইহার দু'দিন পর রাত্রি প্রভাত হইলে দেখা গেল বিভার ঘরের দুয়ার খোলা পড়িয়া আছে,—অথচ বিভা সেখানে নাই। রজনী গৃহস্থালীর কোন কাজে আসিয়া প্রথমে ইহা আবিষ্কার করিল। বিভা হয়ত নীচেও যাইতে পারে—বলিয়া রজনী প্রথমে কথাটা উচ্চবাচ্য করে নাই, কিন্তু নীচেও যখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সে বিভার ঘর আবার ভাল করিয়া দেখিল,—দেখিল সঙ্গে সঙ্গে বিভার বড় সুটকেসটাও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। নরেনের কাছে খবর দিতে গিয়া দেখিল নরেনও ঘরে নাই।

নমিতা লোকের সাড়া পাইয়া বালিশ হইতে মুখ তুলিয়া, একবার দেখিয়া আবার বালিশে মুখ গুঁজিল। যেটুকু দেখা গেল তাহাতে বুঝা যায়, সারা রাত্রি নমিতার মোটেই ভাল কাটে নাই,—মুখে এমন একটা বিবর্ণতার ছোপ যে দেখিলে মনে হয় যেন একটা মরা মানুষ কোন যাদুমন্ত্র বলে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। কাঁদিয়া চোখের পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে। রজনী জিজ্ঞাসা করিল—'বাবু কোথা ?'

নমিতা বালিশে মুখ রাখিয়াই বলিল—'জানি না।'

রজনী এ বাড়ীর অনেক দিনের চাকর,—অনেক ঘটনারই সে খবর রাখে। কথাটা সে মোটেই ভাল শুনিল না। বিভা নাই নরেনও নাই,—আবার নমিতা কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে,—

ব্যাপারটা বড় সহজ বলিয়া বোধ হইল না। সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কথাটা যখন জানাজানি হইল তখন বিভার ও নরেনের ঘরে ভিড় জমিয়া গেল।

বিভার ঘরে সমস্ত জিনিষপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল,—এ বাড়ীর দেওয়া সকল জিনিষই রহিয়াছে, শুধু বিভার শ্বশুর-বাড়ী থেকে আনা স্লুটকেসটী বিভার সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে। নারাণ বেশ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিল—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত সে রাখিয়া যায় নাই।

এমন একটী অসম্ভাবিত ঘটনায় বড়বৌয়ের হর্ষ না বিষাদ হইয়াছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা যায় না। বিভার সহিত নরেনকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না,—তাহাতে নানা কথাই মনে আসে,—কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহই কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না।

ক্রমে বড়-বৌ সদলবলে নমিতার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নমিতা ততক্ষণ নিজেকে অনেকটা সংযত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বড়বৌয়ের বিচারে—সে যে এতক্ষণ এরূপ একটী বিপর্য্যয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিতে পারিয়াছে,—ইহাই এক গুরুতর অপরাধের প্রমাণ।

'ঠাকুর-পো কোথা?'

চোখ না তুলিয়াই নমিতা বলিল—'জানি না।'

'রাত্রে ঘরে ছিল?'

'হাঁ।'

'সারা রাত ?'

'হাঁ।'

ঘরের বাহিরে যেখানে ছেলেমেয়েরা—ভিড় করিয়া তুলিয়াছিল সেখানে প্রভাত দাঁড়াইয়া—সকল কথা শুনিল। নমিতার এমন মূর্ত্তি আর কোনদিন সে দেখে নাই। এমন দারুণ বিপদে—নমিতার এত বেদনায় সে কোন কাজেই আসিতে পারে না—বাহিরে দাঁডাইয়া দাঁড়াইয়া সে শুধু সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। প্রভাতের মনে হইল জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরুপায় সে, সব চেয়ে বড় দুঃখী।

বড়-বৌ প্রশ্ন করিয়া চলিলেন—

'সকালে তাকে দেখেছ ?'

'না।'

নমিতা কিছুতেই মুখ তোলে না,—ইহার মাঝে নিশ্চয়ই কিছু রহস্য—থাকিয়া থাকিবে।

'রাত্রি শেষে ঠাকুর-পো ঘরে ছিল ?'

এইবার নমিতার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। একটু বিরক্তির সুরেই সে বলিল—'জানি না !'

বিরক্তিরই বা কারণ কি ?

বড়-বৌ আবার বলিলেন—'তোমার রাঙাদি রাত্রে এখান থেকে চলে গেছেন—তা জানো ?'

নমিতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—'রাঙা দি !'

'হাঁ, তাই এত সব খোঁজ করতে হচ্ছে। ঠাকুর-পোই বা

কোথায় গেল—সেও এক মস্ত ভাবনা হয়ে পড়েছে। তুমি হয়ত বিরক্ত হয়ে উঠছ—কিন্তু কি কোরব? বড় দায়ে পড়েই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে,—বড় নিরুপায় হয়ে পড়েছি আমরা। তুমি এ সবের কিছু জানো ত বলো,—রাঙাদিকে দেখেছ কাল রাত্রে?'

উত্তর দিতে নমিতা যেন ক্ষণকাল একটু দ্বিধা বোধ করিল, তারপরেই বেশ সহজ কণ্ঠে উত্তর দিল - 'কৈ না!'

বাড়ীর ড্রাইভার মতিলাল ছেলে মানুষ, বয়স এখনও পঁচিশ ছাড়ায় নাই, বাড়ীর সকলেই তার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলেন। গোলমালে সে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল,—সে বলিল—'আমি দেখেছি বলে মনে হয়।'

'কি রকম?'

'রাত্রি প্রায় একটার সময় আমি একবার বাইরে এসেছিলাম,—আমার ঘরের সামনে থেকে উপরের প্রায় সবই দেখা যায়।'

বড়বৌ অধীর হইয়া বলিলেন—'কি দেখলে তাই বল!'

'দেখলাম উনি দাঁড়িয়ে আছেন—ছোটবাবুর ঘরের জানালার পাশে—'

কথাটা শুনিয়া নমিতার বিবর্ণ মুখের উপর একটা রাঙা আভা মুহূর্তের জন্য আসিয়া আবার মিলাইয়া গেল।

নারাণ বলিয়া উঠিল—'হাঁ, অমনি তিনি থাকতেন মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে—আমরাও দেখেছি—বহুদিন।'

বড়বৌ নারণকে ধমক দিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন—এমন সময় অকস্মাৎ নরেন আসিয়া তাহার ঘরের সামনে এত লোকের সমাগম দেখিয়া হাঁক ছাড়িল—

'কি, ব্যাপার কি ?'

তার চোখ মুখের দিকে চাহিয়া কেহই কথা কহিতে সাহস করিল না,—শুধু বড়বৌ বলিলেন,—'আচ্ছা লোক যা'হক,—তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল ত ?'

'কেন,—বেড়াতে।'

'আর আমরা এদিকে ভেবে ভেবে মরি।'

'কেন, এত ভাবনার কি হ'ল ?'

'আজ সকাল থেকে রাঙা বৌকে এ বাড়ীতে পাওয়া যাচ্ছে না—জানো ?'

নরেন যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল, তারপর নারাণের দিকে তাকাইয়া বলিল—'তোরা এখানে দাঁড়ায়ে যে !'

মুহূর্ত্তের মধ্যে বড় বৌ বাদে আর সকলে নীচে নামিয়া গেল। বড় বৌ আর নরেন বিভার ঘরে গিয়া হয় ত বিভা সম্বন্ধেই কি বলা-বলি করিল, তাহার পর ঘরের বাহিরে আসিয়া বড়বৌ বলিলেন—'তোমার দাদার কথা ভাবতে হবে না, তাকে বোঝানোর ভার আমিই নিলাম,— কিন্তু নমিতাকে আজ পাঠিয়ে কাজ নেই, এমন পাঠাতে হয়—না হয় আসছে রবিবারে পাঠিও।'

নরেনের মুখ আবার কঠিন হইয়া উঠিল।'

'না আজই,—এ বেলায়ই আমি ওকে রেখে আসছি।'

বড় বৌ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—'যদি নিতান্তই আজ ওকে পাঠাতে চাও,—তবে তোমার গিয়ে কাজ কি ? আজ রবিবার আছে—গাড়ীতে মতিলালের সঙ্গে আশিস থাকলেই—নমিতা যেতে পারবে।'

'বেশ !'

*　　*　　*　　*

নরেন ভাবিয়া ছিল—সেদিন নমিতা চলিয়া গেলেই সে মনের শান্তি ফিরিয়া পাইবে। সকাল সকাল স্নান করিয়া, খাইয়া—সে ঘরে আসিয়া দোর বন্ধ করিল। বিছানায় শুইয়া সে শান্তিতে ঘুমাইবে বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল,—মনে হয় পাশে নমিতা গুমরাইয়া কাঁদিতেছে।

এ মনের দুর্ব্বলতা—নরেন উঠিয়া বসিল। বাহির হইতে বুঝি কান্নার শব্দ কানে আসে। নরেন উঠিয়া জানালা বন্ধ করিল, পর্দ্দা টানিল। বিভা বুঝি পর্দ্দার পাশে দাঁড়াইয়াছিল,—এই সরিয়া গেল।

নরেন আবার বিছানায় আসিয়া শুইল,—কিন্তু এ তাহার কি হইল,—ঘরের প্রতি কোণ নমিতার অস্ফুট করুণ আর্ত্তনাদে ভরিয়া গিয়াছে। জোর করিরা অন্য কিছুতে মন দিতে গেলে মনে হয়—বিভা একখানা শাদা কাপড় পরিয়া স্লটকেস হাতে করিয়া—সর্ব্বহারার মত অনির্দ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে তাহার মূর্ত্তি ক্রমে অপনীয়মান হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। অথবা বিদেশযাত্রী কোন গাড়ীর মেয়ে কামরায় বিভা একা স্লট-কেসের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়াছে—আর প্রমত্ত দানব বিরাটহুঙ্কারে লৌহবর্ত্ত কাঁপাইয়া তাহাকে বহন করিয়া চলিয়াছে—দূরে,—আরও দূরে,—কতদূরে তাহার বুঝি কোনদিনই ঠিকানা মিলিবে না।

প্রভাত আজ কতকাল পরে বাড়ী আসিয়াছে।

রাত্রে খাওয়ার সময় কুমুদিনী ছেলের পাশে আসিয়া বসিলেন। কত দিন তাহাকে সামনে বসাইয়া খাওয়ান না।

'হাঁ রে, বড়ী যে একটাও খেলি না।'

'এই খেলাম ত!'

'খেলাম ত!—সবই ত পড়ে রইল। তুই ছেলেবেলা বড়ী ভালবাসতিস্—শুনে বউমা নিজে বড়ী দিয়েছে।'

ইন্দু রান্না ঘরে বাটীতে মাছের ঝোল তুলিতেছিল—শুনিয়া জিভ কামড়াইল।

'ঘণ্ট কেমন হয়েছে?'

'বেশ।'

'বউমা আজকাল বেশ রাঁধে।'

ইন্দু মাছের ঝোল পরিবেশন করিতে আসিয়াছিল,—শাশুড়ীর প্রশংসা শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ীর কথা আর ফুরায় না,—তিনি বলিয়া যান—

'বউমা আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে,—আমার সেবা যত্নে একটু ত্রুটী করে না, কোন কাজে অপঘেন্না নেই,—বর্ষায় কাঠের কষ্ট হবে বলে নিজে হাতে ঘুটে দিয়েছে। গোয়াল ঘরের চালে ঐ যে লাউগাছ দেখছিস্, মাঁচায় ঐ যে শসা গাছ—ও ত বউমাই রুয়েছে'—তারপর স্বর নীচু করিয়া ছেলের কানের কাছে মুখ লইয়া বলেন—

'বিয়ের সময় বউ দেখে তোর মনে উঠে নি,—তখন ছিল বউ রোগের হাড়ি,—জ্বরে জ্বরে অমন হ্যাংলা চেহারা হয়েছিল। কিন্তু এখন ?—এই ত সেদিন অবিনাশের মা এসেছিল বেড়াতে—ওরা কাশী থাকে—এসে বৌ দেখে বলে—'এ কার স্ত্রী ?'

বলি—'আমার প্রভাতের।'

'ও-মা, সেই বউ এমন হয়েছে !'

মায়ের প্রলাপ শুনিতে শুনিতে প্রভাত অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কলিকাতার সমাজের নিক্তিতে মাকে ওজন করিতে গিয়া লজ্জায় —মনে মনে প্রভাতের মাথা হেঁট হইয়া আসে, মুখে বলে—'মা তুমি থামো।'

কিন্তু মায়ের উৎসাহ আর থামে না। মা বলেন—

'এখন এই বউয়ের কোল জুড়ে এক সোনার চাঁদ আসে... তবেই আমার চোখ জুড়োয়।'

প্রভাত রাগিয়া বলে—'তুমি না থামলে আমি এখনি ভাত ফেলে উঠে যাবো—বলছি।'

মা ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া থাকেন।

রাত্রে শুইতে আসিয়া ইন্দু বলে—

'তোমার কি হয়েছে বলো দেখি !'

প্রভাত বিস্মিত হইয়া বলে—'কেন কি হয়েছে ?'

'তাই ত জিজ্ঞাসা করছি।'

'কেন,—মায়ের উপর রাগ করলাম বলে ?'

'না।'

'তবে ?'

'তুমি বাড়ী আসা অবধি অনবরত ভাবছ কি?'

'কৈ,—কিছু নয় ত!'

ইন্দু স্বামীর শিয়রে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া—কি যেন বুঝিতে চেষ্টা করে।

প্রভাত পান চিবাইতে চিবাইতে বলে—'এখন ঢং রাখো, শোও।'

ইন্দু শুইয়া প্রভাতের গায়ে হাত রাখিয়া বলে—'তোমার নতুন বৌদির গল্প করো শুনি।'

'এত গল্প থাকতে তার গল্প যে!'

'কেন নাম করতে বাধে না কি?'

প্রভাত কেমন করিয়া তাকায়। ইন্দু বলে—

'রাগ করো না—লক্ষ্মী,—তাকে তোমার খুব ভাল লাগে কি না—তাই বলছি।'

'ভাল লাগে—কে বললে তোমায়?'

'এই তুমিই বলছ—কে আর বলবে, নইলে বাড়ী আসো না কেন?'

উত্তরে প্রভাত একটীও কথা বলিল না,—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল।

'কি কথা বলছ না যে!'

'ঘুম পাচ্ছে।'

'কতদিন পরে এলে, একটু পরে না হয় ঘুমুবে।'

প্রভাত সে কথাগুলি শুনিল কিনা বুঝা যায় না।

ঘড়িতে এগারো, বারো, একটা বাজিয়া গেল, ইন্দুর চোখে

আর কিছুতেই ঘুম আসে না। এতদিন প্রাণপণে সে যে দুশ্চিন্তার বোঝা বহন করিয়া আসিয়াছে—আশা ছিল একজনের পায়ে তাহা নামাইয়া দিয়া সে আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে; কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে কি যে হইল ইন্দু তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছে না—অথচ তাহার দু' চোখ ছাপাইয়া কেবলই জল আসিতেছে।

সেদিন রাত্রি শেষে প্রভাত জাগিয়া দেখে ইন্দু তখনও ঘুমায় নাই।

'কি এখনও ঘুমাও নি তুমি?'

'ঘুমিয়েচি ত।'

ডীজ্ হেরিকেনের স্তিমিত আলোক উদ্দীপ্ত করিয়া প্রভাত দেখে জাগরণ ও দুশ্চিন্তার ক্লান্তিতে ইন্দুর মুখচোখ কালি হইয়া গিয়াছে।

'এমন পাগল!—ঘুমুলে না কেন?'

মৃদু হাসিয়া ইন্দু বলে—'ঘুম এল না—তাই।'

'ঘুম এল না কেন,—আমি কি কোন কষ্ট দিয়েছি তোমায়?'

'না, তুমি কষ্ট দেবে কেন?'—বলিতে গিয়া ইন্দুর আবার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল 'কি কষ্ট বলো।'

ইন্দু স্বামীর বুকে মাথা লুকাইয়া বলিল—'তুমি বাড়ী আসো না কেন?'

প্রভাত দেখিল নমিতা শ্রান্ত দেহমন লইয়া সত্যই আজ তার বুকের নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইন্দুর সান্নিধ্য ভুলিয়া গিয়া

তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—সে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকে --'নমিতা, নমিতা,—ও নমিতা—ও—'

ইন্দু কিন্তু সেই বুকেই—সেদিনও তার পরম শান্তির সন্ধান পাইয়াছিল।

বড় বৌ ও নারাণ নমিতাকে লইয়া বড় মুস্কিলেই পড়িয়াছে।

কথাটা এত স্পষ্ট—অথচ শত ইঙ্গিতেও নরেনের মাথায় ঢুকিতেছে না। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে যাহারা যাদুমন্ত্রে পুরুষদের ভেড়া করিয়া রাখে, নমিতা বোধ হয় সেই দলের, নইলে—

নারাণ বলে—'একদিন ধরিয়ে দাও না হাতে নাতে, সকাল সন্ধ্যায় যে সব ঢং চলে!'

সেমিজে ফুল তুলিতে তুলিতে বড় বৌ বলেন—

'বিধাতা যে মেরে রেখেছেন—কেলেঙ্কারিটা যে আমাদেরই... সেটা বুঝছিস না?'

নারাণ হয়ত কথাটা বুঝিল, বলিল—

'আসল মুস্কিলই ত সেইখানে, নইলে দেখে নিতে এতদিন! বউটা ত ডেমাকে কারো সঙ্গে কথাই বলেন না।'

দাঁত দিয়া সুতা কাটিতে কাটিতে বড়বৌ বলেন—

'ডেমাক নয় গো—ডেমাক নয়—'

'তবে?'

'দেখিস না,—ছোকরাটাও কেমন মন মরা হয়ে বেড়ায়?'

নারাণ চুপ করিয়া মাথা নাড়ে,—কথাটা ঠিকই।

'আচ্ছা ছোটবাবু এসব চোখে দেখতে পায় না?'

'সে ত প্রভাতকে আরও বেশী করে মিশতে বলে দিয়েছে—নইলে—ছোটবউয়ের শরীর খারাপ, মন খারাপ—দেখবে কে ?'

নারাণ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে—'মাগো !'

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ যায়।

চুলগুলি রৌদ্রে মেলিয়া আঙুল দিয়া টানিতে টানিতে নারাণ বলে—'আচ্ছা, ছোটবাবুর আজকাল আর কিছু ক্ষোভ নেই—তাই না ?'

'ক্ষোভ আর কি,—সে ত জানে তারই ছেলে আসছে।'

'অথচ যখন দেখবে !'

'কেউ তা দেখতে পায় না রে নারাণ।'

ঠোঁট উল্টাইয়া নারাণ বলিল—

'কেউ যদি না-ই দেখে তবে আমাদেরই বা কি ব'য়ে গেল ?'

বড়বৌয়ের মন এ কথা মানিয়া লইতে চাহে না।

'এ সব সামনে দেখে—তাই বলে চুপ করে থাকতে হবে না কি ?'

নারাণ একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলে—

'চুপ করে থাকতে কে বল্‌ছে গো,—আমি ত কতদিন থেকে বলছি—করো না একটা বিহিত,—আমি কোথাকার কে,—তোমাদেরই ত বংশের ছেলে গো।'

বউবৌ ভিতরে ভিতরে উষ্ম হইয়া উঠেন—আবার দাঁত দিয়া সুতা কাটিয়া বলেন—

'তাই হবে,—ওঁকে বলতে হবে আজ, নইলে চলছে না।'

নারাণ চোখ কপালে তুলিয়া বলে—

'সে কি গো,—তুমি বড়বাবুকে বলো নি আজও!'

'না।'

সেদিন রাত্রে প্রকাশবাবু গড়গড়ার নল নামাইয়া যখন কোল বালিশ টানিয়া লইলেন,—ঘুমন্ত মীনাকে এক পাশে শোয়াইয়া বড়বৌ তাঁহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—'ওগো,—ঘুমুলে?'

প্রৌঢ়ত্বের সীমা রেখায় আসিলেও সে ডাকে প্রকাশবাবুর মনে তারুণ্যের ঝিলিক্ হানিয়া গেল। পাশ ফিরিয়া, গুম্ফের নীচে হাসির রেখা টানিয়া তিনি বলিলেন—'না।'

অপর পক্ষ হইতে তারল্যের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ধীরে সুস্থে শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বড়বৌ বলিলেন—'ঘুমিও না, কথা আছে।'

প্রকাশবাবু বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

তারপর স্বামীর কেশ-বিরল মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বড়বৌ যখন তাহার বক্তব্য শেষ করিলেন, তখন প্রকাশবাবু উত্তেজনায় উঠিয়া বসিয়াছেন।

বড়বৌ তাহাকে ধমক্ দিয়া বলিলেন—'ওই ত তোমাদের দোষ,—কথাটা শুনলে আর সইতে পারো না,—অথচ আমরা ত কতদিন থেকে জানি,—এতদিন তবু হজম করে এসেছি,—স্বামী যে এত আপন, তার কাছে পর্য্যন্ত গোপন করে এসেছি।'

প্রকাশবাবু কোন উত্তর না দিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বড়বৌ হয়ত কথাটা কহিয়াই মুক্তি পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশবাবু তারপর অন্ততঃ তিনবার তামাক সাজিলেন। নিজে

ভাবিয়া কোন কূল-কিনারা না পাইয়া যখন তিনি ডাকিলেন—
'ওগো শুনছ ?'

বড়বৌ তখন স্বামী-পরিত্যক্ত শয্যা-ভাগে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া—পরম পরিতৃপ্তিতে একবার গভীর নাসিকা-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রভাত যখন নমিতার ঘরে গেল,—তখন নমিতা বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে।

অন্যদিন প্রভাত আসিলে হাজার দুঃখের মধ্যেও নমিতার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে; নমিতা ছুটিয়া আসিয়া প্রভাতের আসনে ভাল গদী দিয়া সরাইয়া তাহার বসিবার জায়গাটীকে বিশেষ লোভনীয় করিয়া তোলে; আজ কিন্তু প্রভাতকে দূরে স্বেচ্ছায় কুশান-হীন চেয়ারেই বসিতে হইল, আর নমিতা বিছানায় শুইয়া নিতান্ত স্বার্থপরের মত নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিল।

প্রভাত নমিতাকে এমনটী আর কখনও দেখে নাই।

দূরে বসিয়া নমিতার অলক্ষ্যে নমিতাকে দেখিয়া দেখিয়া ওর হৃদয় মমতায় ভরিয়া উঠিতেছিল। ইচ্ছা হয় ছুটিয়া গিয়া ওর রাঙা চোখ থেকে জলের বিন্দুটুকু ও সযত্নে মুছাইয়া দেয়, ওর ক্রন্দন-স্ফীত দুটীগণ্ডে, রেশমের মত কালো মাথার চুলে ও ওর আঙুলের পরশ একবার বুলাইয়া দেয়। শুধু একটুখানি সান্ত্বনা। নাঃ— এ কি ভাবনা! প্রভাত নিজের মনকে শাসন করে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়,—কিন্তু কেন—এতই বা কেন? বেড়াল-কুকুরের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে মানুষের বাধে না,—যত বাধে মানুষের বেলা!

এ কেবল মানুষের মনের জবর-দস্তি।

প্রভাতের মনে অনেক বিদ্রোহের কথাই মাথা নাড়া দিয়া উঠে,

প্রভাত তাহাকে আমল দেয় না। আজ তার মনে হয়, আজ যদি সে নমিতার ভাই, বোন, মা, পিসী হইয়া জগতে আসিত—তাহা হইলে বুঝি একটা সান্ত্বনার পথ খুঁজিয়া পাইত।

নমিতা বিছানা হইতে মুখ তুলিয়া একবার প্রভাতের দিকে তাকাইতেই তাহার চক্ষু আবার সজল হইয়া উঠিল,—সে আবার চোখ নত করিল।

প্রভাতের মনের কুয়াশা ক্রমে অপসারিত হইতে থাকে। নমিতার ক্ষীণ রক্তহীন পাণ্ডুর দেহের দিকে তাকাইলেই তাহার কান্নার কারণ বুঝিতে পারা যায়, বিকৃতদেহ প্রকাশের লজ্জা ঢাকিতে নমিতার হয়ত সামর্থ্যে কুলায় না। প্রভাতের মনে হয় —আজকাল এত না আসিলেই বুঝি ভালো হয়।

কিন্তু নমিতার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারে না—মনে মনে অনেক বিতর্ক চলে।

আসিয়া অবধি কথা বলা হয় নাই, অথচ এমন মুহূর্ত্তে কি কথাই বা বলা যায়—প্রভাত তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। নীরবতা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল—এমন সময় বালিশের নীচ হইতে একখানা খোলা খাম বাহির করিয়া নমিতা প্রভাতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—'মামীমা লিখেছেন।'

মন্দাকিনীর চিঠি পড়িয়া প্রভাতের মনের ঘোর আরও কাটিয়া গেল। একই বেদনা তাহা হইলে দুইজনকে ক্লিষ্ট করে, অথচ প্রাণ খুলিয়া এই দুঃখের কথা কেহই কাহাকে বলিতে পারে না।

মন্দাকিনী মামীমা হইয়াও নিঃসঙ্কোচে কত কথা লিখিয়াছেন, অথচ প্রভাত কত অসহায়।

ইহাতে সত্যকার ক্ষতি কি লাভ—প্রভাত সে সম্বন্ধে কাহারও সহিত তর্ক করিতে চায় না, কিন্তু তুলাদণ্ডে যদি কেহ লাভ ক্ষতির বিচার করে,—তবে প্রভাতের ক্ষতির পরিমাণ কাহারও চেয়ে কিছু-মাত্র কম নয়। কে যেন ওর অন্তরের দেববিগ্রহকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। বহুদিনের কল্পনার ছবি যখন রূপ পাইতেছিল—কে যেন তখন তাহাকে মসী-লিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সৌন্দর্য্য-বিধ্বংশের প্রচেষ্টার নগ্ন-কদর্য্যতা প্রভাতের অন্তরকে লজ্জিত করে, ক্ষুব্ধ করে। যাহাকে দেহ দিয়া কোনও দিনই ধরা ছোওয়া যায় না—তাহাকে দুহাতে নিংড়াইয়া পান করিবার ব্যর্থ প্রবৃত্তি মানুষের কেন—প্রভাত ভাবিয়া পায় না।

আবার মনে হয়—হয়ত ইহার আরেকটা দিকও আছে। নারীর অন্তরে বাহিরে যখন মাতৃত্বের আগমনী সুর বাজিতে থাকে—সে তার সব সম্পদ বলি দিয়া বুঝি সেই দেবীকে পূজা করে, কিন্তু নমিতা? নমিতার বেলায়ও কি সেই এক কথা? মাতৃত্বের আহ্বানে সেও কি—

ভাবিতেই প্রভাতের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসে। ওর আদর্শ-বাদের সাথে কোথায় যেন এর একটা বিরাট স্বাতন্ত্র্য আছে। ভয়ে ভয়ে নমিতার দিকে চাহিয়া তাহাকে একবার এই প্রসঙ্গে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চায়।

প্রভাত মন্দাকিনীর চিঠিখানার উপর চোখ রাখিয়াই এত কথা ভাবিতেছিল,—তারপর হঠাৎ যখন নমিতার দিকে চাহিল তখন ভাসিয়া গেল তার সকল সন্দেহ,—কোথা হইতে নামিয়া আসিল জীবনের সব চাইতে বড় দুর্ব্বলতা—মুহূর্ত্তের বিস্মরণ। ছুটিয়া

গিয়া সে নমিতার শিয়রে বসিল—তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া তাহার মাথার উপর হাত রাখিল।

প্রভাতের মমতার স্পর্শে নমিতার চোখে আবার বান ডাকিল। প্রভাত কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে বুঝিতে না পারিয়া—আবার জল মুছাইয়া দিল—

'কাঁদে না লক্ষ্মী—'

প্রভাত আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় মনে হইল বাহিরে যেন অস্পষ্ট শব্দ। তাকাইয়া দেখিল দরজার পর্দ্দায় কালো কালো ছায়া পড়িয়াছে। হৃদ্‌পিণ্ড তখন এমন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে যে তাহাকে থামাইয়া নমিতাকে বাঁচাইবার আগেই পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে আসিলেন—বড়বৌ, নরেন ও নারাণ।

নমিতা একটুও নড়িল না—যেমন ছিল তেমনি শুইয়া রহিল। প্রভাত নিজেদের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করিতে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নরেন আর বড়বৌয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কথা আর বাহির হইল না—মুখের কাছে শুধু একটী অস্পষ্ট শব্দ বাহির হইয়াই থামিয়া গেল।

মাঠের পর মাঠ পার হইয়া একখানি ট্রেন বিরাট দৈত্যের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। কার্ত্তিকের শেষে রাত্রি গভীর না হইলেও বাতাসে বেশ একটু শীতের রেশ মিশানো ছিল—বিশেষতঃ পশ্চিমে। বাহিরে ফ্যাকাশে জোছনা দূর-পর্ব্বতে, শাল-মহুয়ার পাতায়, বন-প্রান্তরে পড়িয়া চারিদিক রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

একটী তৃতীয় শ্রেণীর ছোট কামরায় আরোহী মাত্র পাঁচ জন। দুইজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী—একটী সস্তা কম্বল বিছাইয়া বসিয়া মাঝে মাঝে খৈনী খাইতেছে, মাঝে মাঝে গান ধরিতেছে, আবার গান থামিলে গল্প করিয়া হাসিতেছে। দেখিলে মনে হয় ইহারা কলিকাতায় চাকুরী বা কুলিগিরি করিয়া দেশে ফিরিতেছে।

তৃতীয় ব্যক্তি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক—মধ্যবয়স্ক, সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। 'রাগ'এর উপর চাদর ও বালিশ লইয়া তিনি একটী ক্ষুদ্র শয্যা রচনা করিয়া লইয়াছেন।

অপর পার্শ্বে বেঞ্চে যে তরুণ তরুণী বসিয়া আছে তাহারা বাঙ্গালী দেখিয়া ভদ্রলোক প্রথমে আলাপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরপক্ষ হইতে কোন উৎসাহ না পাইয়া তিনি শীঘ্রই ক্ষান্ত হইলেন।

'আপনারা কোথায় যাবেন?'—'রাগ'টী বিছাইতে বিছাইতে ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

'বেনারস।'

'সেখানে চাকরী করা হয় নাকি ?'

'না।'

'তবে—এমনি বেড়াতে ?'

একটা অস্পষ্ট 'হুঁ' শব্দ করিয়া ছেলেটী ঐ যে জানালার দিকে মুখ ফিরাইল,—আর ভদ্রলোকের দিকে ফিরিল না।

মেয়েটী অনেক আগে থেকেই বাহিরের দিকে মুখ করিয়া ছিল।

ভদ্রলোক অগত্যা বিছানায় শুইয়া একটী সিগারেট ধরাইলেন। বাহিরে তাকাইলে দূরে পাহাড,—মাঝে মাঝে দুই একটী গাছ, খাল বিল হয়ত দেখা যায়, কিন্তু ঐ দুইটীর জ্বালায় কি তাহা দেখিবার উপায় আছে ? হয়ত মনে করিবে বুড়ো নির্লজ্জের মত উহাদের দিকেই চাহিয়া আছে।

গাড়ীর সামনের দেওয়ালে লেখা—কুড়ি জন বসিবেক। পাশের বাঙ্কে হয়ত ঐ দুটীরই জিনিস পত্র,—হয়ত কেন—তাই।

ভদ্রলোক আরামে সিগারেটের ধূঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে প্রথমে অন্য-মনস্ক ভাবে,—পরে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে তাকাইয়া দেখিলেন—বাঙ্কে একটা স্যুটকেসের পাশে রহিয়াছে একটা সদ্য-ক্রীত অনতি-বৃহৎ ট্রাঙ্ক,—তাহার উপর একটী নূতন সতরঞ্চে বাঁধা বিছানা। জিনিসের নূতনত্বে ভদ্রলোকের ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল। তিনি এবার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন—সতরঞ্চের মাঝের তোষকটী পর্য্যন্ত নূতন, মায় সুজনীটা পর্য্যন্ত। এমন কি এখান হইতে উহার নূতনের ছাপটী পর্য্যন্ত দেখা যায়। এইবার তাহার

মুখ দেখিয়া বোধ হয় তিনি সকল বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। একবার চোখ বুঝিয়া কি ভাবিয়া লইয়া আবার চোখ মেলিয়া তিনি একবার মেয়েটীর দিকে চাহিলেন। মেয়েটির মুখখানার সবটা দেখা যায় না, যেটুকু দেখা যায় তাহা সেদিনকার চাঁদের মতই একেবারে ফ্যাকাশে।

দেহটা আগে দেখিতে চাহেন নাই, কিন্তু যখন চাহিলেন তখন দেখিলেন—গলার নীচু থেকে সারা গা একটা শাদা রামপুরী চাদর দিয়া ঢাকা।

আবার যাচ্ছেন—বেনারস!

ভদ্রলোকের এবার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। মৃদু হাসিয়া সিগারেটের শেষ-অংশটুকু ফেলিয়া দিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

যদি কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিত তবে মাঝে মাঝে তাহার পায়ের সঞ্চালন ও মুখের মৃদু হাসি দেখিয়াই বুঝিতে পারিত—ভদ্রলোক আর যাহাই করুন,—অধুনা নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছেন না।

অনেকক্ষণ পর ছেলেটি বলিল- 'বিছানা পেতে দি?'

উত্তর শোনা গেল—'না।'

ঐ পর্য্যন্তই।

রাত্রি একটায় একটা ষ্টেশনে ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন, হিন্দুস্থানী দুইটাও।

শিটি দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলে প্রভাত বিছানাটা বিছাইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল—'আর বসে থাকে না—অসুখ করবে।'

জানালার বাহিরে দূরে দৃষ্টি রাখিয়াই নমিতা বলিল—'ইচ্ছা করে না শু'তে।'

'ইচ্ছা না থাকলেও শু'তে হবে,—বিদেশে অসুখ করে যদি?'

'আমি ত শু'লাম,—কিন্তু নিজে?'

'আমি জেগে পাহারা দেবো,—ফাঁকা গাড়ীতে দু'জনাই ঘুমানো চলে না।'

'তা' হলে আমিও শোবো না, আমার ঘুম পাচ্ছে না—আমিই পাহারা দিচ্ছি বরং।'

তুমি বলিতে নমিতার আবারও বাধিয়া গেল।

প্রভাত হাসিয়া বলিল—'তুমি বলতে না পারলে কিন্তু চলবে না, বরং এখন কিছুক্ষণ কথা বলে অভ্যাস করে নেওয়া দরকার—নইলে এ নিয়েই হয়ত অনেক অনর্থের সৃষ্টি হ'তে পারে।'

নমিতা কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

'তুমি' বলিতে প্রভাতেরও বাধে, তবু প্রভাত জোর করিয়া বলিল—'আর অত ভাবে না, এবার শুয়ে পড় দেখি লক্ষ্মীর মত।'

শুনিয়া নমিতার মুখ চোখ আবার কেমন হইয়া যায়, উঠিয়া বিছানায় শুইয়া বালিশে মুখ গোঁজে।

প্রভাত শিয়রে বসিয়া মাথার চুলে হাত রাখিয়া বলে—'কি, খুবই কি খারাপ লাগছে?'

নমিতা মুখ না তুলিয়াই মাথার ইসারার কি জানায়—ভাল বোঝা যায় না।

প্রভাত মুখটা আরও একটুও নত করিয়া বলে—'এমনি করে এসে কি খুব খারাপ করেছ বলে মনে হয় ?'

এইবার নমিতা প্রভাতের দিকে চাহিল। দুইটী চোখ আবার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—

'বিনা দোষে ওরা আমায় তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু তুমি কেন এলে ?'

ম্লান হাসিয়া প্রভাত বলিল—'ওরা ত আমাকেও তাড়িয়ে দিলে,—এক সঙ্গেইত তাড়িয়েছে।'

'কিন্তু তোমার ত ঘর ছিল। আমার জন্যে—'

নমিতার চোখে আবার বান ডাকিল।

প্রভাত নমিতার মাথায় অধিকতর স্নেহে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে বলিল—'অমনি করে বললে সত্যিই আমার বড় কষ্ট হয়। দোষে হ'ক, নির্দোষে হ'ক আমার জন্য তুমি ঘর ছাড়া হবে আর আমি তোমাকে পথে বসিয়ে নিশ্চিন্তে ঘর করব,—আমাকে এমন ভাবলে আমাকে কি করা হয় বোঝ না ?'

'কিন্তু আমি যে শান্তি পাই না'—বলিয়া নমিতা উদাস-দৃষ্টিতে প্রভাতের দিকে চাহিল।

'কেন ?'

'বিনা দোষে আর একজনের—'

কথাটা আর শেষ হইল না। প্রভাত একটু চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর বলিল—

'জগতের সকল কর্ত্তব্য হয়ত এক সঙ্গে করা চলে না, মানুষ

তা' পারে না—অথবা মানুষে পারলেও ভগবান তার সুযোগে দেন না,—তাই সব চাইতে বড়টা বেছে নিতে হয়।'

নমিতার মুখে যেন একটু আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল—

'সত্যি বড় ?'

প্রভাত নিবিড় স্নেহে নমিতার দিকে চাহিয়া বলিল—'জানো না ?'

পরম শান্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নমিতা বাঁ হাতখানা প্রভাতের কোলের উপর তুলিয়া দিল।

এই নীরব আত্মসমর্পণে প্রভাত যাত্রাপথে নূতন বল সঞ্চয় করিল। সে বলিল—

'শুধু অন্তরের কথা ছাড়া—বাইরের দিকে দেখতে গেলেও এর চাইতে বড় কর্ত্তব্য এখন আর আমার নেই। যাদের কথা ভেবে তোমার সঙ্কোচ লাগে, তা'দের তবু জগতে দাঁড়াবার ঠাঁই আছে,—আর এ দিকে ?'

কথাটার ভিতরে নিছক প্রেম ছাড়া বুঝি একটু অনুকম্পার গন্ধও ছিল,—নমিতা তাহার হাতখানা ধীরে ধীরে গুটাইয়া লইল।

প্রভাত হতভম্ব হইয়া বলিল—'ব্যথা দিলাম ?'

ম্লান হাসিয়া নমিতা বলিল—'কই না !'

মিথ্যা কথায় মানুষ বুঝি সময়ে মানুষের চক্ষে আরও বড় হইয়া উঠে, প্রভাত কিছুক্ষণ নমিতার সহিত কথা কহিতে সাহসই করিল না।

জানালা দিয়া একরাশ জোছনা আসিয়া নমিতার গায়ে মাথায় পড়িয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রভাতের মনে হইল :

মানুষের কতটুকু মানুষ কাছে পায় জীবনের সকল হারাইয়া সে যাহাকে ভালবাসিল সে আজ এত কাছে থাকিয়াও কত দূরে। সে আজ জীবনে প্রথম উপলব্ধি করিল—শুধু কাছে রাখাই কাছে পাওয়া নয়,—সান্নিধ্য দূরত্ব সৃষ্টি করে, দূরত্বকে আরও বিস্তৃত করে।

কিছুক্ষণ পরে চোখ না মেলিয়াই নমিতা বলিল—

'কথা বলছ না যে!'

প্রভাত চমকিয়া উঠিল।

'এমনি।'

হাতটা প্রভাতের কোলে আগাইয়া দিয়া নমিতা বলিল—'ব্যথা দিয়েছি?'

'কই না!'

নমিতা মৃদু হাসিয়া বলিল—'শোধ দিলে—নয়?'

প্রভাত কিছুই উত্তর দিল না, ভাবিল—এ বোঝে না কেন?

নমিতা বলিল—'তাইত ভয় হয়—তোমাকে এত কাছে পেয়ে আমি না হারাই, কত দুঃখই যে তোমায় আমার দিবার আছে!'

প্রভাতের অলক্ষ্যে নমিতার চোখ আবার সজল হইয়া উঠিল।

'সে ভয় তুমি করো না।'

'সে ভয় যে ভগবান আমার দেহের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন।' নমিতা এবার স্পষ্ট কাঁদিয়া প্রভাতের হাত ধরিয়া বলিল—'তুমি তা' সইতে পারবে?'

চোখের জল মুছাইয়া দিয়া প্রভাত স্থির কণ্ঠে বলিল—'তুমি কেঁদো না, তোমার জন্য আমি সব পারব।'

'লোকের কাছে সে যে পরিচয় নিয়ে এসে দাঁড়াবে, তা' সইতে পারবে ?'

'পারব।'

উচ্ছ্বাসে নমিতা হঠাৎ উঠিয়া প্রভাতের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—'তুমি মানুষ নও—দেবতা !'

প্রভাত আবার যখন নমিতাকে হাত ধরিয়া শোয়াইয়া দিল, তখন গাড়ী আর এক ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আগন্তুক যাত্রীর প্রতীক্ষায় তাহারা কাণ পাতিয়া রহিল।

কথাটা চাপিবার হইলেও চাপা রহিল না।

কুমুদিনী পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, প্রকাশের চিঠিখানা পড়িয়াই—'প্রভাত রে, শেষে তুই এই করলি, তোর মনে কি এই ছিল'... বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ইন্দ্ রাঁধা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল; কান্নার সুরে তখন তাহার বুকের ভিতর দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে।

কুমুদিনী চিঠিখানা ইন্দুর দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—'এই নাও, এইবার তোমার সাধ মিটলো, কুক্ষণে কালনাগিনী ঘরে এনেছিলাম, আমার সব খেলে গো, সব খেলে।'

পাশের বামুন-বাড়ী থেকে পচা, মিনি ও ক্ষেপা ছুটিয়া আসিল, আর তাদের পেছনে আসিলেন—তাহাদের বিধবা পিসী মোক্ষদা ঠাকুরুণ।

তাহাকে দেখিয়া কুমুদিনী আবার কাঁদিয়া উঠিলেন—'আমার কপাল পুড়েছে দিদি, অলুক্ষুণে বউটা আমার সব খেলে গো—সব খেলে...।'

মোক্ষদা বুদ্ধিমতী,—বুঝিলেন এ মরা-কান্না নয়,—বলিলেন 'তুমি চুপ করো বউ, আগে থেকে অত চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করো না।'

তারপর পচা, মিনিকে ধমক দিয়া বলিলেন, 'যা, তোরা বাড়ী যা—'

ইন্দু চিঠিখানা হাতে করিয়া ঐ যে রান্নাঘরে ঢুকিল—আর বাহির হইল না।

কুমুদিনী মোক্ষদার কাছে যখন ছেলের কীর্ত্তির বর্ণনা শেষ করিলেন, তখন মোক্ষদার ভা'জ বিধুমুখী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

চোখের জল না মুছিয়াই কুমুদিনী বলিলেন—

'তোমরাও ত জানো ছোট-বউ—ছেলের আমার স্বভাব? ছেলেবেলা থেকে দেখছ ত? ওই ডাইনীটা তার মাথা বিগড়ে দিলে,—ডাইনী, পেত্নী,—কোনও দিন একটু আদর যত্ন করলে না ছেলেটাকে,—যেমনি রূপ, তার তেমনি গুণ। রূপ ত নেই,—তা' একটু পয় পরিষ্কার থাক্,—তা' না। ওর গায়ের গন্ধে ভূত পালায়,—আমার ছেলে পালাবে না?'

বিধুর বয়স অল্প, কথাগুলি শুনিয়া তাহার মুখে একটু বেদনার ছায়া দেখা গেল।

'বউ কই?'

মোক্ষদা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন।

ইন্দু তখন সেখানে ঘরে কপাট দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

বিধু কত চেষ্টা করিল, ইন্দু দোর কিছুতেই খুলিল না।

সে ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, কুমুদিনী বলিতেছেন—

'এত লোক মরে, কই ওর ত মরণ-ও নেই,—তা' হ'লেও ত একটা ব্যবস্থা হ'ত। সেবার দেখলে ত জ্বরে ভুগে শল্‌তে সারা,—তারপর আবার আমাশা আরম্ভ হ'ল,—ভবানী ডাক্তার ত

একরকম বিদেয় দিয়েই গেল,—তবু সেরে উঠলো, এমন বিষ-কঞ্চির ঝাড়।'

বিধু কাতর হইয়া বলিল—'আহা, এমন করে বলবেন না, মানুষ ত,—ওরই কি কম লাগছে!'

মোক্ষদা বলিলেন—'সত্যিই ত! ছেলেমানুষ, ওর দোষ কি? রান্নাঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওকে কিছু বলো না। ছেলে গিয়েছে,—ছেলে আবার আসবে,—পুরুষ-ছেলের আবার কি? তুমি শুধু চেঁচামেচি করে গাঁ জানাজানি করো না। অত উতলা হ'য়ো না,—ছেলে তোমার দু'দিন বাদেই ফিরে আসবে।'

কুমুদিনী তাহাতে প্রবোধ মানিতে চাহেন না,—বলেন 'তোমরা পাগল হ'য়েছ, ওই সর্ব্বনাশী থাকতে ছেলে আমার ফিরে আসবে?'

তারপর খুঁটীতে কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে কুমুদিনী পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন—'ভগবান্, হায় ভগবান্, তুমি কোথায়! হয় ঐ সর্ব্বনাশীকে নাও, নয় আমাকে নাও,—আর সহ্য হয় না।'

সহ্য হয় না তবুও সহ্য করিতে হয়।

মোক্ষদা ও বিধুমুখী আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া—আরও দুটী সান্ত্বনার কথা আশার কথা বলিয়া যান। যাইবার সময় বলিয়া যান—কথাটা যেন গোপন থাকে।

কথা কিন্তু গোপন থাকে না।

স্নানের বেলা কলসী কাঁখে করিয়া বিন্দের মা আসে, ভবী গয়লানী আসে, দরদের তাদের সীমা নাই—

'খবরটা শুনে ভাবলাম একটু দেখে যাই, এমনি কচি বউ, বিধবা মা, তাদের ফেলে ছেলে শেষে এই করলে! বুকের দুধ দিয়ে তুমি কাল সাপ পুষলে বউ ; শেষে কাল সাপেই দংশন করলে!'

যাহারা বছরে একদিন বিনা প্রয়োজনে বাড়ীর ছায়া মাড়ায় না,—তাহাদের সহানুভূতিতে গা জ্বলিয়া যায়, কুমুদিনী কথার জবাব দেন না।

ভবী বলে—'তুমি একবার কলকাতা যাও না গা,—একবার নিজে গিয়ে দেখে এসো,—হয়ত সহরেই তারা কোথায়ও গা ঢাকা দিয়ে আছে।'

হইতেও পারে।

কুমুদিনী হঠাৎ একটু আশার আলো দেখিতে পান,—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়—প্রকাশ তাহাদের পলায়নের যে কারণ ইঙ্গিত করিয়াছে—তাহা যদি সত্য হয় তবে তাহাদের কলিকাতা থাকিবার কথা নহে। যে সোনার চাঁদ দেখিবার জন্য তাহার রাতে ঘুম নাই, সেই—

ভাবিতেই কুমুদিনীর মন আবার বিষ হইয়া উঠিল। তিনি ভবীর কথার উত্তরে বলিলেন—

'তোমাদের মুরুব্বিয়ানা করতে কে ডেকেছে এখানে—যেখানে যাচ্ছ যাও না!'

ভবী কুমুদিনীর রকম দেখিয়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল, তারপর বিন্দের মাকে ডাকিয়া বলিল—

'চল লো চল, আমরা ছোটলোক, এ সব ভদ্রলোকের ঘরের কথা আমরা কি বুঝি?'

বিন্দের মা তার শূন্য-কলসী কাঁখে তুলিয়া বলিল—'চল।'

এমনি করিয়া সারাদিন লোক আসিল গেল। নানা লোকের নানা যুক্তি শুনিয়া কুমুদিনীর কান ঝালাপালা হইয়া গেল। ইহাদের এত গা পড়িয়া উপদেশ দিতে কে ডাকিয়াছে?

বেলা পড়িয়া আসিল।

বিধু-মুখী ছেলেপিলেদের খাওয়াইয়া,—কাজ মিটাইয়া আবার আসিয়া দেখে কুমুদিনী সেই বারান্দায় ঠায় বসিয়া আছেন।

'আপনি এখনও স্নান করেন নি?'

কুমুদিনী কোন উত্তর দিলেন না।

'স্নান করে কিছু মুখে দিন'—বলিয়া বিধু তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল।

'ছেলে যখন প্রাণে বেচে আছে, তখন নিশ্চয় আবার ফিরে পাবেন,—অমন কত হয়,—আবার নেশা কেটে গেলে সব ঠিক্ হয়ে যায়।'

বিধুর কথার আশ্বাসেই বুঝি কুমুদিনী স্নান করিতে গেলেন।

কিন্তু ইন্দুর ঘরে গিয়া দেখা গেল, ইন্দু বালিশে মুখ গুঁজিয়া নিস্পন্দ পড়িয়া আছে। বিধুর শত টানাহেঁচ্‌ড়াতেও উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

বিধু জোর করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল—ইন্দুর চোখমুখ ফুলিয়া গিয়াছে, চোখের কোণে, গালে শুক্‌নো জলের দাগ। বিধুর সাধাসাধিতে তাহার জিদ্ যেন আরও বাড়িয়া গেল, সে জোর করিয়া ঐ যে বিছানা আকড়াইয়া ধরিল, বিধু শত চেষ্টায়ও তাহাকে তুলিতে পারিল না।

'এমনি করে পড়ে থাকলেই সে ফিরে আসবে না কি? উঠে চারটী মুখে দে নইলে বাঁচবি কি করে?'

বালিশে মুখ গুঁজিয়াই ইন্দু উত্তর দিল—'বাঁচতে চাই নে আমি।'

'ওলো থাম, কত জনেই মরে, বলে সবাই ও কথা! এত সাধ যদি—মন ভুলোতে পারিস নি কেন?'

'চাই না কারো মন ভুলোতে'

'তবে মর! কিন্তু মরবার আগে শাশুড়ীকে ত চারটী খেতে দিবি?'

'যদি দরদ থাকে, দাও না কেন খেতে, রান্নাঘরে রাঁধা রয়েছে ভাত।'

'তবু তুমি উঠ্‌বে না?'

'না'

'আচ্ছা থাকো, দেখি কতদিন কাটে এমনি!'

বিধু চোখ মুখ ঘুরাইয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল।

কুমুদিনী স্নান করিয়া আসিয়া ঘরে কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—'নাও, ওঠো, নেয়ে এসে চারটী গেলো।'

সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, আর দেরী করিলে কুমুদিনীর খাওয়া হইবে না, ইন্দু উঠিয়া বসিল।

বিধুর শত চেষ্টাতেও যাহার জিদ্ একটুও টলে নাই, সে অতি সহজ কণ্ঠে বলিল্ -

'আপনি ভাত বেড়ে খেতে বসুন, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি।'

সেদিন পুকুর হইতে আসিতে ইন্দুর একটু বিলম্ব হইতেছিল। কুমুদিনীর একটু ভয় ও হইল—পরের মেয়ে, দুঃখটা ওর কি কিছু কম লাগিয়াছে? নিজের দুঃখে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, নইলে কটুকথা কুমুদিনী ইন্দুকে কোনও দিনই বলেন নাই। কুমুদিনী নিজে পেটে মেয়ে ধরেন নাই, কিন্তু ইন্দুকে পাইয়া মনে মনে মেয়ের অভাব তার সত্যই ঘুচিয়াছিল। আজ ভাগ্য দোষে নিজের কটূক্তিতে সেও যদি তাহাকে ছাড়িয়া যায়—কুমুদিনীর বুক আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। ইন্দুর এখনই একবার খোঁজ করা দরকার। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া সিড়ীতে কেবল পা দিয়াছেন এমন সময় বিধুর বড় মেয়ে শান্তা দৌড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—'মেজ পিসীমা, শীগ্‌গির এসো।'

শান্তার রকম দেখিয়াই মেজ পিসীমা অর্দ্ধেক বুঝিয়া ফেলিলেন। তারপর কুমুদিনীর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার এবং শান্তার আর কিছু বলিবার আগেই নিতাই বাগ্দী দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল—

'মেজ ঠাকরুণ, শীগ্‌গির এসো, তোমার বেটার-বৌ জলে ডুবেছে, কলসী ভাস্‌ছে। বাদল। আর কুড়নকে আমি জলে নামিয়ে দিয়েছি, দেখি গৌরের মনে কি আছে?'

কুমুদিনী যখন পুকুরের ধারে আসিলেন তখন সেখানে অসংখ্য লোকের ভিড় জমিয়াছে।

মৃত্যুর উৎসব। লোকের মুখে আতঙ্ক, উৎসাহ,—কথা।

'কে প্রথম দেখলে?'

'পচীর মেয়ে দাসী, ও বাসন মাজতে আসছিল।'

'তখনই তুললে না কেন?'

'ও মা বলিস কি গো! ও কি সাঁতার জানে?'

জনতা এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—লাস পাওয়া গিয়াছে।

'পা ধরে ঘুরাও—জল বেরিয়ে যাক্।'

একটি বিশ বাইশ বছরের ছেলে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'তোমরা সরো দেখি, মাত্র দুটি লোক চাই আমি।'—বলিয়া ইন্দুর দু'খানি হাত ধরিয়া তাহার মাথার কাছে হাটু গাড়িয়া বসিল।

ষোল সতের বছরের দুইটী ছেলে—বোধহয় স্কুলে পড়ে—ছুটিয়া আসিল। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। কুমুদিনী এইবার মৃতদেহের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্দুর দেহের দিকে তাকাইলে মনে হয় স্নান করিয়া এই মাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল। ভিজে চুলগুলির কয়েকটী আসিয়া মুখে চোখে পড়িয়াছে, সুকোমল অধরোষ্ঠের ফাঁকে সামনের শাদা দাঁতগুলি যেন একটু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, চক্ষু দুইটী মুদ্রিত,—নিদ্রা আসিয়া যেন তার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিয়াছে।

কুমুদিনী এতক্ষণ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য লইয়া পাশে দাঁড়াইয়া—একদৃষ্টে ইন্দুর দিকে তাকাইয়া ছিলেন। তাহার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। কিন্তু বড় ছেলেটি কৃত্রিম শ্বাস বহাইতে আবার যখন ইন্দুর হাত তুলিল—তখন হঠাৎ তিনি পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ইন্দুর গায়ের উপর পড়িয়া তাহাকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—'ও মা,—মা, মা গো—'

ছেলেগুলি তাহাকে সরাইতে গেল,—পাশের লোকজন ছুটিয়া আসিল,—কিন্তু কেহই তাঁহাকে সরাইতে পারিল না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—'ও গো না, না তোমরা জানো না,—সে ফিরবে না, ফিরবে না গো ফিরবে না।' তারপর ইন্দুর বুকের উপর মাথা রাখিয়া তা'রই উদ্দেশ্য বলিতে লাগিলেন—

'আমিই তোমায় যেতে বলেছিলাম, তাই তুমি চলে গেলে মা, তুমি ফিরে এসো মা,—আমি কাকে নিয়ে ঘর করবো,—তুমি আবার ফিরে এসো মা—'

ইন্দু যে আর ফিরিয়া আসিবে না, এখন আর সে বিষয় কাহারো সন্দেহ রহিল না।

তবুও বড় ছেলেটি কৃত্রিম শ্বাস বহাইতে ইন্দুর শিথিল বাহু দুইটি আবার তুলিয়া ধরিল।

প্রভাত নমিতাকে ভালবাসিয়া ঘর ছাড়িয়াছে, ইহাতে সে ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে সে বিচার আমরা করিব না। বিশ্বের যে শক্তি উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালাকে নিজের খেয়ালে মুহূর্ত্তে মহাসাগরে পরিণত করে, মাটির বুকে যাহার ইঙ্গিতে অগ্নির স্রোত বহিয়া যায়, জগতের প্রতি স্পন্দনে যার ধ্বংসের রুদ্র-নাচনের লীলা চলে, সে নাকি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া এ জগৎ কেবলি নূতন করিয়া গড়িয়া চলিয়াছে। প্রভাত বিশ্বের এই ছন্দের তালে পা রাখিয়া চলিয়াছে কি না কে জানে?

সে কি সুখী হইয়াছে, শান্তি পাইয়াছে?

তাই বা কে জানে?

শুধু দেখা গেল একদিন বেলা দশটায় কাশীর চৌরাস্তা দিয়া প্রভাত হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মাথায় ছাতা নাই, তা' না থাক—প্রভাত কোন দিনই ছাতা ব্যবহার করিতে পছন্দ করিত না। পরিচ্ছদ অর্দ্ধ-মলিন,—জুতা জোড়া কয়েক দিন ব্রাশ করা হয় নাই,—চুলের আর সে পারিপাট্য নাই। সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটি অযত্নের ছায়া।

কিন্তু আরও একটু লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইত কি একটা মধুর আনন্দ—আশার কথা তাহার মনকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। এত অল্প টাকায় মন এত খুশী হইয়া উঠিতে পারে, প্রভাত আর কোন দিন তাহা এমন করিয়া বোঝে নাই। মাসের বিশ দিন

পড়াইয়াই পূরা মাসের মাহিনা প্রভাত ত্রিশ টাকা পাইয়াছে। সরকার সাহেব আরও বলিয়াছেন—সামনের মাসে তার মেয়ের বাড়ীতে গানের টিউসনী দিবেন। প্রভাত তার পাঞ্জাবীর ডা'ন পকেটে হাত দিয়া তার মানিব্যাগটা বার বার দেখিয়া লইতেছে।

এ ভালই হইল, নমিতার একখানা গহনাও বেচিতে লাগিবে না। প্রভাতের টাকা না ফুরাইতেই ত্রিশ টাকা হাতে আসিল, সামনের মাসে আরও আসিবে, তারপর হয়ত আরও,—এমন কি শেষে একটা চাকরীও মিলিয়া যাইতে পারে।

তারপর প্রভাতের মনে হইল—এ টাকা দিয়া কি করা যায়? খরচ অবশ্য নিজের জন্য নয় এটা নিশ্চিত,—কিন্তু নমিতার জন্যই বা কি কেনা যায়? একটা উপহার!...না, না, না,—এই দারিদ্র্যের জীবনে উপহার, সে নিতান্তই অশোভন—বিশেষতঃ যখন অর্থের শত প্রয়োজন এক সঙ্গে আসিয়া দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নমিতার রাঁধিতে কষ্ট হয়,—দুই একটা বাসন, আর একটা ঠিকা রাঁধুনী। বিশ্বেশ্বরের দয়ায় রাঁধুনীর অভাব নাই এখানে। কিন্তু নমিতা যা মেয়ে সে কি রাজী হইবে? একটী পয়সা অপব্যয় করিতে সে রাজী নয়!'

কিন্তু একি অপব্যয়?

ডাইনে এক দোকানে স্তরে স্তরে শয্যাদ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। —প্রভাতের হঠাৎ মনে হইল নমিতার একটি ভাল তোষকের দরকার। কলিকাতায় কেনা পাতলা তোষকটি লইয়া কতবার তাহাদের ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। নমিতা নিজের বিছানায় তোষকটী

কিছুতেই লইতে চাহে না,—কতদিন তোষক আর ভাল বালিশে প্রভাতের বিছানা করিয়া নিজে কম্বলের উপর চাদর পাতিয়া বিছানা করিয়াছে। লোকের চক্ষে একঘরে থাকিলেও নিজেদের মনের তাগিদায় তাহারা দুই বিছানার মাঝে রাত্রে একখানা সাড়ীর পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া লয়।

প্রভাতের কেমন হাসি পাইল—অদৃষ্টের পরিহাস! কতদিন আর এ সাধনা চলিবে?

প্রভাতের মনের মাঝে আদর্শ-বাদী লোকটী উত্তর করিল: চিরকাল,—চিরকাল, অনন্ত যুগ ধরে—দেহের কূলে আমার অসীম প্রেমের ভেলা বাঁধতে চাই নে—আমি।

প্রেমাস্পদকে পেয়ে আমার অপাওয়ার তীব্র জ্বালাকে জুড়াতে চাই নে আমি। প্রেম শুধু একটী আলোক বর্ত্তিকা,—উচ্চ থেকে উচ্চতর লোকে শুধু আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

একখানা মোটার প্রভাতের গায়ের উপর আসিয়া ব্রেক্ কষিল।

'একটু দেখে চলবেন মশাই।'

প্রভাতের বুকের ভেতর একটা হাতুড়ীর ঘা দিল মাত্র। প্রভাত পাশ কাটাইয়া বাঁয়ে চলিল।

—হাঁ, একটী তোষক, ভাল তোষক,—নমিতাকে না বলেই কিন্‌তে হ'বে, চমকে দেব।...দরকার হ'লে সামনের মাস থেকে দুটী ঘর।

প্রভাত তাহার দূরের পূজাকে প্রাচীরের ব্যবধানে দূরতর করিতে চায়। মন তাহাতে আপত্তি করিলে প্রভাত তাহাকে বোঝায়—মেঘ আকাশে কতদূরে থাকে—অথচ ময়ূর? মনকে

প্রবোধ দিতে প্রভাতের আরও অনেক বুলি আছে,—দরকার বুঝিলে প্রভাত তাহাদের প্রয়োগ করে।

ভিন্ন ঘরের ভাবনায় মনের কোণে কোথায় একটী ব্যথার সুর—বাজিয়া উঠে। এক ঘরে—তবুও মনে হয় এই ঘরে একখানা প্রিয় সাড়ীর আস্তরণের আড়ালে সে আছে,—তাহার মুখের কথা শোনা যায়। ঘুমাইলে কান পাতিয়া তাহার বুকের শব্দ শোনা যায়।

এ যেন দেবতার বেদী-পাশে ভক্তের বিশ্রাম।

বিদ্যুতের গতি থেকেও নাকি মনের গতি বেশী,—শুধু স্থান নয়,—কালের সীমাও নাকি মন ছাড়াইয়া যায়।

মাস চারেক পরের একখানা ছবি সহসা প্রভাতের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

ঐ সাড়ীর আড়ালে নমিতার পাশে যুই ফুলের মত শুভ্র নির্ম্মল একটী শিশু ঘুমাইয়া আছে, নমিতা তাহার গায়ে ছোট্ট কাঁথাখানা তুলিয়া দিল, তারপর তাহার দিকে একটী সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।...ঘুমের ঘোরে শিশু কাঁদিয়া উঠিলে নমিতা নিজের বুকের সুধা দিয়া তাহাকে শান্ত করিল।......

খোকার অসুখ করিয়াছে,—দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নমিতার মুখে ঘনাইয়া আসিয়াছে, প্রভাতকে দেখিয়া নমিতা নিজের মনোভাব লুকাইতে চেষ্টা করিল। নমিতা হাসিল। প্রভাতও হাসিল।...

খোকা বড় হইয়াছে,—তাহার পরিচয়...

না, না, না প্রভাত তাহা কিছুতেই পারিবে না। প্রভাত নিজে নিজেই মাথা নাড়িতে লাগিল,—মাথার ভিতর হঠাৎ কি যেন

একটা ধাক্কা দিয়া গেল,—খানিকটা অন্ধকার,—ছোট ছোট বালু-কণার মত অসংখ্য আলোক বিন্দু। বাঁ দিকে কাছেই একটা লাইট-পোষ্ট,—প্রভাত তাহা ধরিয়া চোখ বুজিয়া একটু দাঁড়াইল।

একটা রিক্সাওয়ালা ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া ঘুঙুর বাজাইয়া গেল।

প্রভাত চোখ মেলিয়া দেখিল—সামনে ঐ মোড়, তারপর ডাইনে গলি,—একটু চলিলেই তাহাদের বিশ নম্বর বাড়ী।

নমিতা হয়ত তাহার জন্য রাঁধিয়া বসিয়া আছে। কত মমতা —কত প্রীতি তার মুখের প্রতি রেখায়। হৃদয়ের গভীরতার পরিমাপ করা যায় না। এত কাছে পাইয়া ভালবাসিয়াও উহার প্রকৃতি রহস্যময় রহিয়া গেল,—দেহটা ধরাছোওয়ার বাহিরে। এই তার চিরচাওয়া মানসী, জীবনের স্বপ্ন, কবিতার প্রেরণা,—মাটীর মানুষকে আলোর রাজ্যে ডাকিয়া লইবার একটী সকরুণ ইসারা। প্রভাতের মন আবার কেমন করিয়া হঠাৎ বুঝিয়া ফেলিল—সে ভুল করিয়াছে—একটা বিরাট ভুল—মারাত্মক ভুল, নমিতা কাহারও কন্যা নয়, বধূ নয়, জননী নয়, ভগিনী নয়, শুধু তার মানসী—তার চির প্রেমময়ী বিদেহী দেবতা।

প্রভাতের ইচ্ছা করিতে ছিল—এখনই ছুটিয়া নমিতার সম্মুখে গিয়ে—একটী গভীর দৃষ্টিতে তাহাকে সে কথা জানাইয়া দেয়। নমিতা—নমিতা,—নমিতা—

বিপুল আগ্রহে প্রভাতের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। হৃদয়ের ভাবাবেগকে সে সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছুটিতেছিল,—একটুও কম নয়, এর সবটুকু তাহাকে উপহার দিতে হইবে।

এই আর দুই পা,—তারপর শোবার ঘর,—তারপর হয়ত আর

একটা দরজা,—পার হইলেই রান্নাঘরের বারান্দায় নমিতাকে মিলিবে। নমিতা,—আমার নমিতা, জীবনের স্বপ্ন—

প্রভাত পাগলের মত ঘরে ঢুকিল,—তারপর আর একটা দরজা পার হইয়া রান্নাঘর।

নমিতা নাই।

'নমিতা!'

কোন সাড়া নাই।

প্রভাতের বুকের উপর কে যেন একটা বিশ মন ওজনের একটা হাতুড়ীর ঘা মারিল।

অযথা ভয়—প্রভাত ভাবিল, মনে মনে একটু হাসিও পাইল,—কাঙালের মাণিক—।

ছোট তক্তপোষখানার উপর বিছানা থাকিত, তাহার এক পাশে প্রভাত স্থির হইয়া বসিল—এক মিনিটও হইবে না। তারপর পাশের ঘরের বামুন-পিসীর কাছে আসিয়া বলিল—

'পিসীমা, ও কোথায় গেছে জানেন?'

'তা ত জানিনে বাবা,—তুমি চলে যেতেই বৌমা সেজেগুজে কোন বাড়ীতে বেড়াতে গেল;—এখনও ফেরে নি,—আচ্ছা মেয়ে ত!'

কথাটা প্রভাত তেমন সহজ করিয়া লইতে পারিল না। শুনিয়াই সম্মুখে আঁধার হইয়া আসিল, তাহার মধ্যে অসংখ্য জ্যোতি কণা—আলোকের নীহারিকা।

শরীরটা কয়েক দিন ধরিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে দুর্ব্বল, হয়ত তাই—।

প্রভাত তক্তপোষে আসিয়া বিছানার স্তূপে মাথা রাখিল—ক্ষণকাল। এটা তার স্বভাব,—বিপদে পথ খুঁজিতে এটা তার শক্তি-সংগ্রহ। দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নিজেকে উদ্যত করিয়া তোলা।

চোখ মেলিয়া প্রভাত খুঁজিল—নমিতা কি লইয়াছে। ছোট স্যুটকেসটা—নেই ত! তবে?

এক সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশে প্রভাতের দৃষ্টি সমস্ত ঘরকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল—

এই বিছানার উপর হইতে গড়াইয়া তক্তপোষের উপর একখানা খামে চিঠি!

বিদ্যুৎগতিতে প্রভাত খামখানি কুড়াইয়া লইল,—তার সারা দেহ তখন ষ্টার্ট দেওয়া মোটর ইঞ্জিনের মত কাঁপিতেছে।

আর ও দু'সেকেণ্ড প্রভাত চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইল,—বিপদে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

প্রভাত দুটী আগল বন্ধ করিয়া, তক্তপোষে বসিয়া বিছানায় মাথা রাখিল, নিজের শরীরকেই বা এত বিশ্বাস কি!

তারপর খাম খুলিয়া নিজের দেহ মনকে আপ্রাণ চেষ্টায় স্থির রাখিয়া—প্রভাত জীবনে এই প্রথম নমিতার লেখা প্রেম-পত্র পড়িল—

দেবতা,

তুমি যখন আমার এ চিঠি পাবে,—তখন আমি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে না হ'লেও দূরের পথে। আমাকে খুঁজে দেহকে ক্লান্ত, মনকে ক্লিষ্ট করো না। এমন কাজ আমি কেন করলাম, কিসের আশায় করলাম তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে,—তার উত্তর আমি দিয়ে যাচ্ছি।

যে শাখে ফুল ফোটে না

আমি যে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি এর মূলে রয়েছে তোমার ভালবাসা—তোমার অগাধ, অসীম, অনির্ব্বচনীয়,—সকলের উপরে এক নতুন ধরণের ভালবাসা। তোমার ভালবাসার সত্যিকার রূপ তুমি জানো না—কারণ তুমি ভালবেসেছ,—আমি জানি, বেশ ভালো করেই জানি,—কারণ আমি ভালবাসা পেয়েছি। আমায় ভালবেসে তুমি আমার জন্য যা করেছ তা' ভেবে বিস্ময়ে আমি অবাক্ হই,—আর তার প্রতিদানে তোমাকে যা সইতে হ'বে—তার কথা মনে হ'লে ভয়ে আমি শিউরে উঠি।

এখানে থাকলে সে দুঃখ তোমার অনিবার্য্য, অথচ তা' দেবার মত সাহস আমি কিছুতে পাচ্ছি না।

শুধু আজ নয়,—এখানে এসে অবধি—ঐ চিন্তা আমার ভূতের মত চেপে বসেছে।

এক ঘরে বাস করে তোমায় আমি যত বুঝেছি,—তোমায় বিন্দুমাত্র ব্যথা দিবার সাহস আমি তত হরিয়েছি।

তুমি আমায় কি দিয়েছ—তা আমি জানি। পাছে সে রত্ন একটু মলিন হয়, পাছে কেউ কেড়ে নেয় তাই আমি সন্তর্পণে বুকে করে দূরে চলে যাচ্ছি।

একদিন তুমি আমায় মানসী বলে ডেকেছিলে,—আমি তোমার সত্যিই তাই, আমার নিজের গুণে নয়, তোমার ভালবাসার গৌরবে। দেহটাকে বাদ দিয়ে শুধু মনের স্বপ্নকে লোকে এমনি করে ভালবাসতে পারে—তা' শুধু কাব্যেই পড়েছি,—কিন্তু তা যে আমার নিজের জীবনে এমনি করে সত্য হয়ে আসবে, তা' আর কোন দিন স্বপ্নেও ভেবেছি!

একজন অনাহুত এসে আমারই চোখের সামনে তোমার স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে—এ কি আমিও চোখে দেখতে পারবো মনে কর ?

সেই অনাহুত অতিথির মিথ্যা আহ্বানে তুমিই কি সাড়া দিতে পারবে ? আমার মুখ চেয়ে তুমি পারলেও তোমার সে মিথ্যারূপ আমি সইতে পরি না।

তুমি আমায় ভাল বেসেছ এই সত্য,—আমি তোমায় ভালবাসি —আরও সত্য। ভালবাসার মিথ্যারূপ আমি সইতে পারি না।

আমি আজ তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি আমায় সর্ব্বহারা হয়ে ভাল বেসেছ,—তার পরিবর্ত্তে তোমার হাতে আমি কি সম্বল তুলে দিয়েছি—তার হিসাব তোমার কাছে। আমার প্রেমের শূন্য থলি পূর্ণ হয়েছে—জীবনের পথ আমার আলোয় ভরে গিয়েছে। তোমার আত্মার সাথে—আমার আত্মার শুভ-মিলনের শঙ্খধ্বনি আমার অন্তরে শিহরণ তুলেছে, তাই দেহের ধরা থেকে পালিয়ে যেতে যাই।

তুমি ক্ষমা করো—হে বন্ধু, হে দেবতা,—তোমায় ব্যথা দেওয়ার আশঙ্কাই আমার যাত্রা-বেগকে দ্রুততর করে তুলেছে। তোমার টানেই আমি আজ তোমায় ছেড়ে অকূলে যাত্রা করছি। দেহের কারাগারের মেয়াদ শেষ হ'লে তোমার স্বপ্নলোকে, আত্মার জ্যোতি-লোকে আমাদের মিলন সার্থক হ'য়ে উঠবে।

হে বন্ধু, হে প্রিয়তম, বিদায়—

প্রভাত নমিতার চিঠি পড়া শেষ করিয়া পূর্ব্ব অভ্যাসমত মুহূর্ত্তের জন্য একবার চোখ বুজিল,—তারপর আবার যখন চোখ

মেলিল,—তখন তাহার সম্মুখ হইতে জগতের আলো মুছিয়া গিয়াছে,—কুয়াশা,—ঘন, দুর্ভেদ্য, নিবিড়তম কুয়াশা। মানুষের মন —প্রভাতের মনের ভেতর কে যেন অট্টহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল —দুর্জ্ঞেয় ঘন রহস্যাবৃত কুয়াশা।

মনের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া চাহিতেছে—আলো, আলো,—শুধু একটুখানি আলো—